

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস

[illegible] এ, [illegible] রো, [illegible]

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মূল্য : বারো টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

॥ চিত্ত মোদের চিত্তে ॥

চিত্ত মোদের চিত্তদেশে
রাজেন সদা পূজ্যবেশে ॥
চিত্ত মোদের চিত্ত ভ'রে
নিত্য নব বিত্ত গড়ে।

চিত্তরঞ্জন দাশ—আমাদের চিত্তে নিত্য নিত্য নব নব ভাব—বিত্ত সৃষ্টি করেন।—চিত্তরঞ্জনের জীবন-কথা আলোচনা করে আমরা প্রতিদিনই নূতন নূতন মহাভাব প্রাপ্ত হই! লোকে বলে, যে জিনিষ পরশমণির পরশ পায়, সে জিনিষ সোনা হয়ে যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনের নানা কাহিনীও পরশমণির মত। সেই সকল কাহিনী পাঠ করলে, সেই সকল কাহিনীর বিষয় চিন্তা করলে, আমরা উত্তম ভাব প্রাপ্ত হই; ভাল ভাল কাজ করতে ইচ্ছুক হই।

স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে আছেন বহুশীর্ষ দেবতা—বহু মস্তকযুক্ত দেবতা; আছেন বহুনেত্র দেবতা—বহু নয়নযুক্ত দেবতা, আছেন বহুবক্ত্র দেবতা—বহু মুখযুক্ত দেবতা; আছেন বহু বাহুদেবতা—বহু হস্তযুক্ত দেবতা; আছেন বহুপাদ দেবতা—বহু পদযুক্ত দেবতা।

মানুষের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশও ছিলেন ঠিক ঐরূপ এক মানুষ। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; ছিলেন জ্ঞানী ও গুণী; ছিলেন বক্তা ও রচয়িতা; ছিলেন কর্মী ও মর্মী; ছিলেন ত্যাগী ও অনুরাগী।

উদ্যানে থাকে নানারকম ফুলের তরু; নানারকম ফলের তরু।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনেও আছে নানারকম সুকর্ম। সেই সকল সুকর্মই নানারূপে মানুষের সেবাকর্ম। মানুষের সেবার দ্বারাই মানুষ সেব্য হয়—সম্মান প্রাপ্ত হওয়ার পাত্র হয়।

॥ বরেণ্য বিক্রমপুর ॥

বিক্রমপুর বিখ্যাত বটে। বিক্রমপুর গৌরবের স্থান। বিক্রমপুর বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত।

চিত্তরঞ্জন দাশ বিক্রমপুরের বিক্রমী পুরুষ—শক্তিশালী মানুষ।

বিক্রমপুরে কেবল মাত্র ঐ একজন চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন নি! বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেছেন বহু 'চিত্তরঞ্জন'।—বহু গুণবান মানুষ।

বিক্রমপুরের গৌরব চিরকালের। বিক্রমপুরের রামপালের হরিশ-দীঘি হরিশচন্দ্রের বংশের বিখ্যাত নিদর্শন। গোপীচন্দ্রের সুচারু কাহিনী, মানিকচন্দ্রের মহাকাহিনী, অতুনা-পাতুনার উপাখ্যান বিক্রমপুরেরই বটে।

একদা রামপালের অনল-কুণ্ডে অসৎ লোকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য জীবন বিসর্জন করেছিলেন বাঙ্গালী নারী।

রাজা আদিশূর যশ লাভ করেছেন প্রচুর। তিনি রামপালে একটি যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞ অতি বড় রকমের যজ্ঞ। আদিশূর কান্যকুজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেছিলেন সেই যজ্ঞের জন্য। সেই ব্রাহ্মণদের হাতের পবিত্র জল নাকি বর্ষিত হয়েছিল শুষ্ক বৃক্ষের উপর। সেই জল সেই গাছকে করেছিল সবুজ, করেছিল শাখা-প্রশাখায় পরিপূর্ণ। বল্লালদীঘির উত্তর তীরে সেই গজারি গাছ আজিও বিদ্যমান।

বৌদ্ধযুগেও বিক্রমপুর ছিল সুবিখ্যাত।

বজ্রযোগিনী বিক্রমপুরেরই একটি গ্রাম। এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। তিনি ছিলেন নানাগুণে গুণী। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও জ্ঞানী। তিনি হয়েছিলেন বিক্রমশীলা

বিহারের অধ্যক্ষ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তিব্বতে ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন।

চাঁদ রায় ও কেদার রায় বিক্রমপুরেরই বিক্রমী পুরুষ। কালীগঙ্গা নদীতীরে শ্রীপুর ছিল তাঁদের রাজধানী।

একদা লোহা দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল একটি মাছ। সেই মাছের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন একটি মানুষ— তাঁর নাম কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার। তিনি মন্ত্রের বলে সেই অদ্ভুত কর্মটি করেছিলেন।

রাজবাড়ীর মঠ, কোটীশ্বর গ্রামের সুবৃহৎ মন্দির বিক্রমপুরেই অবস্থিত। কোটীশ্বর মন্দিরের বেদীর নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল এক কোটী মুদ্রা। সেই থেকেই নাম হয় কোটীশ্বর।

রামগতি রায় বিক্রমপুরেরই সন্তান। তিনি রচনা করে গেছেন মায়াতিমির-চন্দ্রিকা নামক এক পরম পুস্তক। রাজা রাজবল্লভ করে ছিলেন অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ। যজ্ঞের প্রমাণ ইত্যাদি লিখে দিয়েছিলেন একটি নারী। তাঁর নাম আনন্দময়ী। তিনি ছিলেন রামগতি রায়ের কন্যা। রামগতির ছোট ভাই ভারতচন্দ্রের শিষ্য জয়নারায়ণ চণ্ডী কাব্য রচনা করেছিলেন। শিবচন্দ্র ছিলেন সারদামঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা। বিক্রমপুর অবস্থানকালে তিনি কবিতা রচনার শক্তি প্রাপ্ত হন।

আরও বহু যশস্বী ব্যক্তি বিক্রমপুরেরই অধিবাসী ছিলেন। সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গিরিশচন্দ্র বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গুপ্ত প্রভৃতি বিক্রমপুরেই জন্মগ্রহণ করেন।

শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হয়েছিলেন 'ট্রিবিউন' নামক ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদক। তাঁকে বলা হত 'Terror of the Punjab' —পাঞ্জাবের ভীতি। সুবিখ্যাত কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়, সমাজ সংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, চিকিৎসক গুডিভ সূর্য কুমার চক্রবর্তী, বিখ্যাত বিচারক চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিখ্যাত আইনজীবি লালমোহন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, কবি ও দেশনেত্রী সরোজিনী

নাইডু, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন বিক্রমপুরেরই অধিবাসী।

ঐ বিক্রমপুরেরই মধ্যে রয়েছে তেলিরবাগ গ্রাম। এই গ্রামের বিখ্যাত বৈদ্যবংশের সন্তান চিত্তরঞ্জন দাশ—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ চেষ্টা করেছিলেন করতে নাশ ভারতের পরাধীনতা পাশ।

চিত্তরঞ্জনকে বলা হয় দেশবন্ধু। দেশবন্ধু ছিলেন গুণসিন্ধু। বহু বহু গুণের মালা তাঁর জীবনকে করেছিল—আলো—উজ্জ্বল—প্রোজ্জ্বল!

॥ কুল পরিচয় ॥

চিত্তরঞ্জন দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন তেলিরবাগের বৈদ্যবংশে।

এই বৈদ্যবংশ নানা বিষয়েই অনবদ্য—গৌরবময়। এই বৈদ্য কুলের লোকেরা জ্ঞানী. গুণী, দাতা, বহু লোকের বহু দুঃখের পরিত্রাতা—উদ্ধারকারী।

চিত্তরঞ্জনের পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ। চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাশ কাশীশ্বর দাশের ছোট ছেলে।

ভুবনমোহনের বড় ভাইয়ের নাম কালীমোহন দাশ। কালীমোহন কলিকাতার হিন্দু কলেজের এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উকিল হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল শহরে উকিলের কাজ করতেন।

কাশীশ্বর দাশ মহাশয়ও বরিশালে উকিল ছিলেন।

কলিকাতা শহরে কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। কালীমোহন দাশ তখন কলিকাতায় এলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হলেন।

ঐ সময়কার কলিকাতা হাইকোর্টের দুইজন বিশিষ্ট উকিল ছিলেন রমেশচন্দ্র মিত্র ও চন্দ্রমাধব ঘোষ।

কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হয়ে কালীমোহন দাশ যথেষ্ট অর্থ ও সম্মান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে কালী-মোহন গৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

ভুবনের পুত্র ভুবনবিখ্যাত চিত্তরঞ্জন সেই ভবনেই বসবাস করতেন। বর্তমানে সেইখানেই রয়েছে "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন"।

উকিল কালীমোহন ছিলেন সাহসী পুরুষ।

একবার একটি মোকদ্দমায় কালীমোহন উকিল নিযুক্ত হন। সেই মোকদ্দমা তখন হচ্ছিল কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক স্যার স্টুয়ার্ট জ্যাক্‌সনের এজলাসে। উকিল কালীমোহন সেই বিচারকের ভুল দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি আইনের তর্ক তুললেন। বিচারক স্টুয়ার্টও আইনের তর্ক তুললেন, কালীমোহনের ভুল দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তর্ক-বিতর্ক চলতে চলতে উকিল কালীমোহন হঠাৎ ব'লে ফেললেন—"হুজুর, আমি যা বলছি, আইন-পাঠরত একজন ছাত্রও তা বুঝতে পারে কিন্তু আপনি তা বুঝতে পারছেন না। এ তো বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।"

উকিলের ঐ কথায় বিচারক চ'টে গেলেন।

কালীমোহন যাতে আর ওকালতি করতে না পারেন সেই মতলব করে কালীমোহনের বিরুদ্ধে বিচারক অভিযোগ উত্থাপন করলেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, বিচারকের সেই অভিযোগ টিকল না। উকিল কালীমোহনের জয় হল। বিচারে বিচারকেরই হ'ল পরাজয়।

একবার একটা মানহানির মামলা হচ্ছিল। একজনে আর একজনকে বলেছে "শূয়ারকা বাচ্চা"—এই বিষয় নিয়ে মানহানি।

কালীমোহন ছিলেন মামলার বাদী পক্ষের উকিল।

সব কথা শুনে, বিচারক ব'লে উঠলেন, "শূয়ারকা বাচ্চা" বলেছেন,—এটা এমন কি অপরাধ হয়েছে ?

উকিল কালীমোহন তখনই বিচারকের দিকে চেয়ে ব'লে উঠলেন, "হুজুর, কেই যদি আপনাকেই বলে "শূয়ারকা বাচ্চা" তাহলে, আপনার মনে সেটা বেশ ভালো লাগবে কি ?"

বিচারক তখন কট্‌মট্‌ ক'রে উকিলের দিকে চাইলেন। চুপ হয়ে গেলেন। বিচারক যেন একটা বিছার কামড় খেলেন ?

কালীমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন। কিছু কাল পরে, প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দুমতই গ্রহণ করেছিলেন।

একবার কালীমোহনের দ্বিতীয় ভাই দুর্গামোহন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে বর্জন করেছিলেন।

কিন্তু কালীমোহন তখন কি করলেন ? তিনি দুর্গামোহনকে বরিশালে আনয়ন করলেন। তাঁকে বললেন, "তুমি থিওডোর পার্কারের লিখিত পুস্তক পাঠ কর।"

দুর্গামোহন পার্কারের পুস্তক পাঠ করতে লাগলেন।

দুর্গামোহনের মনের ভাব তখন বদলে গেল। তিনি খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা মন থেকে দূর করে দিলেন।

অনেকে তখন বলল, "দুর্গামোহন একটা দুর্গতি থেকে বেঁচে গেলেন।"

কালীমোহন উপার্জন করতেন প্রচুর। দানও করতেন প্রচুর। তিনি তাঁর জন্মস্থানে বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন।

কলিকাতায় তাঁর রসা রোডের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিবমূর্তি। তাঁর পূজার্চনা নির্বাহ হওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করে গিয়েছিলেন।

দুর্গামোহন ধর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজ-সংস্কারে, দানে, স্বদেশপ্রেমে ও পরদুঃখমোচনে সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন।

মানুষের জীবনে অমঙ্গল হচ্ছে জঙ্গলের মত। মানুষের জীবন থেকে সেই অমঙ্গল-জঙ্গল দূর করে, সেখানে মঙ্গল-মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে দুর্গামোহন সর্বদাই উৎসাহ বোধ করতেন।

দুর্গামোহনের মহত্বের নানা কাহিনী যেন কনককাহিনী—সোনার কাহিনী।

দুর্গামোহন যখন ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি কলিকাতার কালীঘাট অঞ্চলে বাস করতেন। সেই সময়ে একটি ছেলের সঙ্গে তাঁর খুবই ভ্রাতৃভাব সৃষ্টি হয়েছিল। ছেলেটি ছিল একজন গোয়ালার সন্তান।

সেই গোয়ালাটির দুধ-দইয়ের দোকান ছিল। দুর্গামোহন প্রায় দিনই সেই দোকানে যেতেন। সেখানে বসে তাঁর সেই গোয়ালাবন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন।

ঐ জন্যে দুর্গামোহনকে নিজের বাড়ীতে অপ্রিয় কথা শুনতে হত। কিন্তু সারাজীবন পরের প্রিয় কার্যকরী দুর্গামোহন তবু তাঁর সেই অল্পবয়স্ক বন্ধুকে পরিত্যাগ করেননি।

তারপরে কালক্রমে, দুর্গামোহন হলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট উকিল। তাঁর রোজগার হতে লাগল প্রচুর টাকা-কড়ি।

আর তাঁর সেই গোয়ালাবন্ধুর অবস্থা তখন কিরূপ?

তিনি তখন মাত্র কুড়ি টাকা বেতনের একজন কর্মী। —বড়ই গরীব।

তবু দুর্গামোহন এবং তাঁর সেই গোয়ালা বন্ধুর মধ্যেকার সেই পূর্ব প্রীতির ভাব তখনও পুরাপুরিই রয়েছে, একটুও কমে নি।

সেই গোয়ালাবন্ধুর কুটিরে দুর্গামোহন প্রায়ই গমন করতেন।

গোয়ালাবন্ধুও দুর্গামোহনের বাড়ীতে প্রায়ই আমন্ত্রণ পেতেন। দুইজনে একসঙ্গে আহার করতেন, আর কত কথাই বলতেন।

ধনী দুর্গামোহনের জীবন-সরোবরে তাঁর সেই গোয়ালাবন্ধুটি ছিলেন যেন একটি পদ্মফুল! উভয়ের প্রীতি ছিল অতুল!

দুর্গামোহন এই মর্ত্য হতে চলে যাওয়ার পরেও তাঁর অর্থ যাতে দরিদ্র লোকের স্বার্থ সিদ্ধ করে, দরিদ্রের সেবা করে, দুর্গামোহন তাঁর উইলে বা ইচ্ছাপত্রে সেইরূপ ব্যবস্থাই করেছিলেন।

দুর্গামোহনের পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবীও ছিলেন স্বর্গের দেবীর মত।

কি করে মানুষের দুঃখের অন্ধকার দূর ক'রে সুখের আলো সঞ্চার করবেন, সেইটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

একদিন ব্রহ্মময়ী গিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের ভবনে।

ব্রহ্মময়ী তখন দেখলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের সহধর্মিণী প্রসন্নময়ী একটা জলের জালায় মুখ দেখছেন এবং চুল বাঁধছেন।

ঐ কাণ্ড দেখে, ব্রহ্মময়ী ব'লে উঠলেন, "একি কাণ্ড!—আয়নার কাজ করছে জল রাখবার ভাণ্ড!"

প্রসন্নময়ীর মুখে হাস্য প্রস্ফুটিত হল।

তিনি বললেন, "আয়না নেই, ভেঙে গিয়েছে। আগামী মাসে আয়না ক্রয় করব। এখন আয়না কেনার টাকা হাতে নেই।"

ব্রহ্মময়ী নিজের মনে মনে বললেন, "আমার হাতে টাকা আছে।" ব্রহ্মময়ী তখনই বাজারে গেলেন। কিছুসময় পরে ফিরে এলেন প্রসন্নময়ীর নিকটে। একখানি আয়না ধরলেন প্রসন্নময়ীর মুখের সম্মুখে।

তখন কি ভাব ফুটে উঠেছিল ব্রহ্মময়ী ও প্রসন্নময়ীর মুখে?

॥ চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন ॥

ভুবনমোহন দাশ ছিলেন কাশীশ্বর দাশের ছোট ছেলে। ভুবনমোহন পরে জগবন্ধু দাশের পোষ্যপুত্র হন। জগবন্ধু দাশ ছিলেন কাশীশ্বর দাশের জ্যেষ্ঠতাত মহোদয়ের ছেলে।

ভুবনমোহন হয়েছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী ও উকিল।

ভুবনমোহন তাঁর ক্ষমতার বলে প্রচুর অর্থ রোজগার করতেন। পরের দুঃখ কষ্ট দূর করবার জন্য দানও করতেন প্রচুর। সৎ লোকের বিত্তসম্পদ পরের উপকারের জন্যই ব্যয়িত হয়। ভুবনের জীবনে এই দৃষ্টান্ত যথেষ্টই দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু ভুবনমোহন নিজের নাম প্রচার করে দান করতেন না। দান করতেন গোপনে। লোকে তাঁর নাম জানুক, তাঁকে দাতা বলে প্রশংসা করুক, এইভাব ভুবনের মনে ছিল না।

ভুবনমোহন যখন যুবক, তখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করে-ছিলেন। ভুবনমোহন ইংরাজী ভাষায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। তখন "ইণ্ডিয়ান মিরর" নামক একখানি পত্রিকা ছিল। ভুবনমোহন সেই পত্রিকায় নানারূপ প্রবন্ধ লিখতেন। সকলে তাঁর সেই ইংরাজী রচনার খুবই সুখ্যাতি করত।

"ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। সেই পত্রিকার জন্য অর্থব্যয় করতে লাগলেন আনন্দমোহন বসু এবং দুর্গামোহন দাশ।

দুর্গামোহন হলেন "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" পত্রিকার সম্পাদক। তিনি নানারূপ রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন সেই পত্রিকায়।

ভুবনমোহন "বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন" নাম দিয়ে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এই পত্রিকাতেও দেখা গেল ভুবনমোহনের নানারূপ মনোরম রচনা।

ভুবনমোহন সেই পত্রিকাখানিতে রাজনৈতিক নিবন্ধ লিখতে লাগলেন। তাঁর রচনার গুণে সকলেই হল তাঁর প্রশংসাকারী।

এমন কি লর্ড লিটন নামক ইংরাজ রাজ-পুরুষও হলেন ভুবনমোহনের ইংরাজী রচনার আগ্রহশীল পাঠক। লর্ড লিটন তখন ছিলেন গভর্ণর জেনারেল।

ভুবনমোহন ছিলেন তখনকার পরাধীন ভারতের মানুষ। কিন্তু তাঁর মন ছিল অতিশয় সাহসী।

একবার ভুবনমোহন হাইকোর্টের একজন বিচারকের বিচার-সম্বন্ধীয় ত্রুটির কথা প্রকাশিত করলেন, "বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন" পত্রিকায়। সেই ত্রুটি সম্বন্ধে খুবই সমালোচনাও করলেন।

এর পরে একদিন বিচারকের এজলাসেই ভুবনমোহন উপস্থিত হলেন একজন আসামীর পক্ষের উকিল হয়ে।

ভুবনমোহন তাঁর বক্তব্য বলতে লাগলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন, সেই বিচারক তাঁর বাক্য মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করছেন না। পূর্ববৎ একটা ত্রুটি করছেন তিনি।

নির্ভীক ভুবনমোহন তখন সেই বিচারককে ব'লে উঠলেন, "হুজুর কোন কারণবশতঃ আমার উপর হয় তো আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন কিন্তু লক্ষ্য করুন যে, এই আসামী আপনার নিকট সুবিচার চায়। আর আশাও করে যে আপনি এর প্রতি সুবিচার করবেন। কারণ সুবিচার করাই হচ্ছে বিচারকের কর্তব্য কর্ম।"

ভুবনমোহন দেখালেন তার রসনার জোর।

ভুবনমোহনের স্পষ্ট কথা শুনে, বিচারক হৃষ্ট হলেন।

যথা সময়ে আসামী নির্দোষ প্রমাণিত হল, এবং খালাস পেল।

ভুবনমোহন শক্তিশালী লেখক। ভুবনমোহন অসাধারণ আইন-জীবী। ভুবনমোহন অসাধারণ দাতা। মানুষের দুঃখের তিনি পরিত্রাতা। কত লোককে যে তিনি কত সময়ে কত টাকা দান করেছেন, তার হিসাব কোন কাগজপত্রে লেখা ছিল না। লেখা ছিল মানুষের মনে।

একবার ভুবনমোহনের এক বন্ধু অর্থাভাবে খুবই দুঃখের অবস্থায় পড়ে গেলেন। কে তাঁর দুঃখ দূর করবে,—এই কথা চিন্তা করতে করতে, তাঁর মনে হল, ভুবনমোহনের হৃদয়-দ্বার উদার।

সেই ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন ভুবনের ভবনে। জানালেন তাঁর বিপদের কথা।

ভুবনমোহন তাঁন বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে তখনই প্রস্তুত হলেন। তাঁর জন্যে চল্লিশ হাজার টাকা জামিন হলেন। তার পরে ভুবনমোহনের বন্ধু সেই টাকা আর পরিশোধ করতে পারলেন না।

সর্বদাই নানা লোককে দান করতে করতে ভুবনমোহন শেষ পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার উপর আবার হল সেই চল্লিশ হাজার টাকার ঋণের বোঝা। ভুবনমোহন শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। এইরূপ না করে, তখন তাঁর আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জন তাঁকে সেই দেউলিয়া অবস্থা থেকে মুক্ত করেছিলেন।—পিতার ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।

আইনজীবী ভুবনমোহনকে স্বার্থের জন্য অর্থ রোজগার করতে হত; কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সর্বদাই পরের স্বার্থের দিকে—পরার্থের দিকে ছিল।

এক পক্ষের উকিল হয়ে, কেবলমাত্র টাকা রোজগার করার দিকেই তিনি মন দিতেন না। উভয় পক্ষের মধ্যে যাতে মোকদ্দমা আপসে মিটে যায় ভুবনমোহন তাই করতে চেষ্টা করতেন।

কলিকাতারর এক বনেদী বংশের লোকদের মধ্যে এক মোকদ্দমা চলছিলাম চল্লিশ বছর ধরে। সেই মোকদ্দমায় অর্থব্যয়ের ফলে, অর্থ যেন যাচ্ছিল জলে। দুই পক্ষই দিন দিন হীন হয়ে পড়েছিলেন।

ভুবনমোহন তখন দুই পক্ষকেই বার বার বলতে লাগলেন, "আপস করুন। তা না হলে, আপনাদের অবস্থা হয়ে পড়বে অতি করুণ—এখন দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে মামলা করছেন। এর ফলে শেষে শুয়ে পড়তে হবে—একেবারে গরীব হয়ে যেতে হবে। এখন আপস না করলে, আপশোস করতে হবে। উপস্থিত হয়ে দারিদ্র্য দশায়, করতে হবে হায় হায়!"

ভুবনমোহনের সার কথা শুনে, দুই পক্ষই অসার মামলার পথ পরিত্যাগ করলেন। মিটমাট হয়ে গেল।

সেই মোকদ্দমা যদি চলতে থাকত, তা হলে ভুবনমোহনের কিন্তু খুবই টাকা রোজগার হত। কিন্তু ভুবনমোহন সেই স্বার্থ ত্যাগ করলেন পরার্থ রক্ষা করার জন্য।

লোকে বললে, ভুবনমোহন ধন্য !

ভুবনমোহন বিজ্ঞ-আইনজ্ঞ ; নিবন্ধ-রচনা-সোনা বিরচনে পটু ; ভুবনমোহন গায়ক, ভুবনমোহন সংগীত রচয়িতা। তিনি অনেক গান লিখে গেছেন। সে সবকে বলা হয় ব্রাহ্ম-সংগীত। তাঁর রচিত কোন গানের সঙ্গেই তাঁর নাম হয়ত পাওয়া যায় না। কারণ আত্মপ্রচার—নিজের নাম প্রচার তিনি চাইতেন না।

ভুবনমোহন, ব্রাহ্মসম্প্রদায়-ভুক্ত হলেও, নিজেকে হিন্দু ব'লেই প্রচার করতেন।

তাঁর পূর্বেকার কুলপুরোহিত ও কুলগুরুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পুরোপুরিই বিদ্যমান ছিল।

তাঁর হিন্দু আত্মীয়রা কোন দিনই তাঁর অনাত্মীয় হয়ে যান নি।

ভুবনমোহনের স্বদেশ জুড়ে ছিল তাঁর হৃদয়ে-দেশ। ইংরাজী-শিক্ষিত অনেক ভারত সন্তান হয় স্বদেশবিদ্বেষী। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত ভুবনমোহন দাশ মনে প্রাণেই ছিলেন তাঁর স্বদেশের দাস।

তাঁর স্বদেশ ভারত সর্ব বিষয়ে উন্নত হয়ে উঠুক, এই ছিল ভুবনমোহনের মনের খাসা আশা।

ভারতের সন্তান বিদেশীকে বিবাহ করবে, এটা তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি মনে করতেন, এইরূপ করা হলে, জন্মভূমিকে অবজ্ঞা করা হয়।

ভুবনমোহনের মেজো ছেলে প্রফুল্লরঞ্জন ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ইংরাজ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। সেই ঘটনায় ভুবনমোহনের

মন খুবই অশান্তিময় হয়ে পড়েছিল। ভুবনমোহন শেষ বয়সে নানারকম অশান্তির মধ্যে পতিত হয়েছিলেন।

তার পরে একদিন এই জগতের দিনের আলো তিনি চিরদিনের জন্যেই হারালেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৮ই আষাঢ় তিনি পরলোকে চ'লে গেলেন।

রেখে গেলেন নানারূপ সংভাব ও সৎ কাজের কাহিনী।

এহেন ভুবনমোহনের ছেলে হয়েছেন চিত্তরঞ্জন।

ভুবনমোহন—সকল মানুষের পরম প্রিয়জন।

চিত্তরঞ্জনের মাতার নাম নিস্তারিণী।

নিস্তারিণীর পুত্র চিত্তরঞ্জন তাঁর জন্মভূমি ভারতকে পরাধীনতার দুঃখ থেকে নিস্তার করতে চেষ্টা করেছিলেন।

নিস্তারিণী ছিলেন সর্বপ্রকার আড়ম্বরবিহীনা।

ভুবনমোহনের ভবনে বিলাতী আচার-ব্যবহার প্রবেশ করেছিল। রান্না করার জন্য বাবুর্চি ছিল ; চেয়ারে ব'সে টেবিলে আহার করা হত ; হিন্দু সমাজের পক্ষে যে বস্তু আহার করা নিষিদ্ধ, সে বস্তুও টেবিলে দেখা যেত।

কিন্তু নিস্তারিণী যেন একহাতে মাতৃস্নেহ এবং এক হাতে ভগ্নী-প্রীতি বিতরণ করতেন। তাঁর কাছে ধনী ব্যক্তি যে ব্যবহার পেতেন, গরীবও সেইরূপ ব্যবহারই পেতেন।

তাঁদের আশ্রয়ে দুই-একজন মন্দ লোককেও দেখা যেত। সেই রূপ একজন লোককে ভুবনমোহন একবার বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে মন্দ হলেও সে ব্যক্তি আশ্রয়হীন ছিল ব'লে নিস্তারিণী সেই লোকটিকে নিরাশ্রয় হওয়ার বিপদ থেকে নিস্তার করেছিলেন—সে তাঁদের আশ্রয়ে পূর্ববৎই রয়ে গেল।

নিস্তারিণী ১৩২০ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন।

॥ ভুবনমোহন-নন্দন ভুবনমোহন চিত্তরঞ্জন ॥

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম, ভুবনমোহন সত্যিই ভুবনমোহন—সকলের মঙ্গল সম্পাদন ছিল তাঁর জীবনের প্রধান কাজ। আমরা দেখলাম, ভুবনমোহনের সহধর্মিনী নিস্তারিণী যেন অমৃতদায়িনী।

ভুবনমোহন-নিস্তারিণীর নন্দন চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন ভুবনমোহন—ভুবনমোহন চিত্তরঞ্জন।—মানুষের দুঃখ ক'রে দূর, সেখানে সৃষ্টি করে সুখের সুর,—এই ছিল চিত্তরঞ্জনের জীবনের সাধনা।

চিত্তরঞ্জন পৃথিবীতে এলেন ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২০এ কার্তিক ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর। শনিবার। দ্বাদশী তিথি।

ঘড়িতে তখন দেখা যায়, বেলা ৪টা বেজে ৪৮ মিনিট হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করলেন কলকাতার পটলডাঙ্গা স্ট্রীটের একখানি ভবনে।

সেই বাড়ীখানি ভুবনমোহনের নিজের বাড়ী ছিল না। ছিল ভাড়া বাড়ী।

পরাধীন ভারতে, ভাড়া-করা পরের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক চিত্তরঞ্জন দাশ।

॥ শিক্ষা ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন শিশু, সেই সময়ে তাঁর পিতা ভুবনমোহন পটলডাঙ্গা থেকে চলে এলেন কলিকাতার ভবানীপুর পল্লীতে।

সেখানে চিত্তরঞ্জনকে ভর্তি করা হল লণ্ডন মিশনারি বিদ্যালয়ে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন হলেন সেই বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

তার পরে, ১৮৮৩ সালে ছাত্র হলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর।

কিন্তু পরবর্তী কালের সেই অদ্বিতীয় পুরুষ দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় ছিলেন না, বহু বিষয়েতেই ছিলেন প্রথম—অগ্রগণ্য।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সেই ছাত্রাবস্থায় সেই মিশনারি স্কুলে গঠিত হল একটি কবিতা-সভা।

কয়েকটি ছাত্র কবিতা লিখত ; কবিতা আবৃত্তি করত।

চিত্তরঞ্জন কবিতা রচনা করতে লাগলেন। কবিতা আবৃত্তিও করতে লাগলেন।

কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর-রচনা "স্বাধীনতা হীনতায়" কবিতাটি চিত্তরঞ্জনের খুবই প্রিয় ছিল।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকবিতা "ভারত-সঙ্গীত" চিত্তরঞ্জনের অতিশয় প্রিয় ছিল। সেই পরমপদ্য "ভারত-সঙ্গীত" করেছিল চিত্তের চিত্তকে এরূপভাবে মণ্ডিত যার ফলে পরবর্তীকালে চিত্ত হয়েছিলেন ভারত-বন্দিত ও বিশ্বনন্দিত। সেই কবিতা দুইটি বেশ বড় কবিতা। স্বাধীনতা ও তেজস্বিতার ভাবে ভরপুর। মানুষের মনকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ করে তোলে।

চিত্তরঞ্জন ঐ দুইটি কবিতাই খুব ভালবাসতেন। ঐ দুইটি বার বার আবৃত্তি করতেন। স্বাধীনতার ভাবে ভরপুর ঐ কবিতা দুইটি চিত্তরঞ্জনের মনে স্বাধীনতা সাধনার মহাভাবের সঞ্চার করেছিল।

চিত্তরঞ্জন তাঁর সেই বাল্যকালে যেসব কবিতা লিখতেন সে সবও বেশ চমৎকারই হত।

॥ চিত্তের চিত্তের বিত্ত ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন সেই মিশনারি বিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন, সেই কবিতা-সভা ও কবিতা, রচনা, উপন্যাসেই একটি ছেলের সাথে তাঁর খুবই প্রীতির ভাব সৃষ্টি হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন বড়লোকের ছেলে, আর সেই ছেলেটি ছিল গরীবের ছেলে। কিন্তু চিত্তের চিত্ত সর্বদাই নৃত্য করত। তাই বড় লোকের ছেলে গরীবের ছেলেকে সমাদর করতে অনিচ্ছুক হয়নি। সেই ছেলেটি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন বিদ্যালয়ের বেতন দিয়ে তার পক্ষে আর লেখাপড়া করা সম্ভব হল না।

লেখাপড়ার পথ ছেড়ে, টাকা রোজগারের পথ তাকে ধরতে হল।

ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ছিল। তার আচার ব্যবহারও ছিল অতি চমৎকার। সে তারপর একটি চাকরি পেল। বিদ্যালয়ের অনেক সহপাঠী তার কথা ভুলে গেল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ তার কথা ভুললেন না।

চিত্তরঞ্জনের মনের বনে সে ফুটে রইল একটি ফুলের মত।

এল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

চিত্তরঞ্জন ইচ্ছা করলেন, তিনি প্রাইভেট ছাত্ররূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবেন।

তখন তিনি ভাবলেন, আমার সেই বন্ধুটিও কি প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারে না?

সেই ছেলেটি কোথায় থাকে, কোথায় চাকরি করে, চিত্তরঞ্জন তা জানতেন।

চিত্তরঞ্জন একদিন দাঁড়িয়ে রইলেন রাস্তার ধারে।

কিছু সময় পরেই, চিত্তরঞ্জন দেখলেন, সেই ছেলেটি আসছে।

চিত্তরঞ্জন এগিয়ে গেলেন সেই ছেলেটির দিকে।

তখন দু'জনের মুখে ফুটল হাসি; হৃদয়ে যেন বাজল বাঁশি।

চিত্তরঞ্জন সেই ছেলেটিকে বললেন, আমি প্রাইভেট ছাত্র হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেব। তুমিও তাই কর না ভাই!

চিত্তের কথা শুনে, সেই ছেলেটির চিত্ত যেন নৃত্য করে উঠল। সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হল।

তারপর, যথাসময়ে, সেই দুই বন্ধুই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন।

চিত্তরঞ্জন সে বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি।

সেই ছেলেটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। তারপর ক্রমে ক্রমে অনেকগুলো পরীক্ষা দিয়েছিল। তিনি হয়েছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট উকিল।

সেই সেদিন, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, চিত্তরঞ্জন সেই ছেলেটিকে পরীক্ষা দেওয়ার যে উৎসাহ দিয়েছিলেন, সেই উৎসাহই হয়েছিল সেই মানুষটির উন্নতীর মূল। উৎসাহের মূল্য বিপুল।

চিত্তরঞ্জন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারি বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন ; উত্তীর্ণ হলেন।

ভর্তি হলেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বি, এ পড়তে লাগলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

কলেজ জীবনে চিত্তরঞ্জন তেমন মনোযোগী ছাত্র ছিলেন না। পাঠ গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়ে, শ্রেণীকক্ষে অনেক সময়েই তিনি থাকতেন অনুপস্থিত।

তাই ব'লে, লেখাপড়ায় তিনি মোটেই অমনোযোগী ছিলেন না। অনেক বই পড়তেন। নানা বিষয়ের বই পড়তেন।

পাঠ তাঁর পক্ষে ছিল যেন নাট !—পরম আনন্দের বিষয়।

।। ইংলণ্ডে গমন ।।

ভারত তখন স্বাধীন ছিল না, ছিল ইংরাজের অধীন।

সেই সময়ে একটি উচ্চ পরীক্ষা ছিল। তার ইংরাজী নাম আই. সি. এস. পরীক্ষা বা ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা।

সেই পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হতেন, তাঁরা জেলাশাসক, জজ এবং বিভাগীয় কমিশনার ইত্যাদি হতে পারতেন।

ইংলণ্ডে সেই আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। ভারতে সেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হত না।

চিত্তরঞ্জন স্নাতক বা বি. এ. পাশ বা গ্রাজুয়েট হওয়ার পর তাঁর ইচ্ছা হল, যে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবেন।

চিত্তরঞ্জন তখন ভারত থেকে ইংলণ্ডে গমন করলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ ইংলণ্ডে গিয়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

কেবলমাত্র বই-পড়া বিদ্যাবলে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যেত না। পরীক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, সাধারণ জ্ঞান, ব্যবহারিক জ্ঞান, এবং রাজনৈতিক অভিনত সম্বন্ধেও বিচার করা হত।

চিত্তরঞ্জন দাশ সেই আই, সি. এস. পরীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি উত্তীর্ণও হয়েছিলেন। কিন্তু উত্তীর্ণদের তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। আই. সি. এস. বলে তাঁকে ঘোষণা করা হয়নি। ইংরাজের ধড়িবাজিই হচ্ছে তার কারণ। এখন সেই বিষয়টাই করা হচ্ছে বর্ণন।

॥ দাদাভাই নওরোজী ॥

দাদাভাই নওরোজী ছিলেন একজন ভারত সন্তান। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। তিনি ছিলেন ভারতের একজন নেতা।

চিত্তরঞ্জন যখন ইংলণ্ডে অবস্থান করছেন, তখন দাদাভাই নওরোজী মহোদয়ও ছিলেন ইংলণ্ডে।

দাদাভাই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের বা সংসদের সভ্যপদ লাভ করবার জন্য ফিন্‌স্‌বারি থেকে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন।

ইংরাজের অধীন ভারতের একজন লোক ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ আইনসভার সভ্যপদ লাভ করবেন, এটা অনেক ইংরাজের কাছেই ভাল লাগল না। তারা দাদাভাই নওরোজীর বিরুদ্ধে নানারূপ প্রচারকার্য আরম্ভ করল।

একদিন তাদের এক সভায় জেম্‌স ম্যাক্‌লীন নামক এক ইংরাজ ভারতবাসীদের খুবই নিন্দা করল। সে বলল, ভারতবাসীরা মোটেই সভ্য নয়। ভারতের লোক গোলাম ছাড়া আর কিছুই নয়। ওদের কোনরকম আদর্শ নেই, সভ্যতাও নেই।

লর্ড সেলিসবারি নামক এক ইংরাজও একদিন দাদাভাই নওরোজীর সম্বন্ধে বলে ফেলেন: That blackman of India—ভারতের সেই কালো লোকটা।

কিন্তু ইংরাজেরা নানারূপে চেষ্টা করেও দাদাভাই নওরোজীকে সেবার নির্বাচনে পরাস্ত করতে পারেনি। তিনি সেবার পার্লামেন্টের সদস্যপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ইংরাজের ধড়িবাজি চুপ ক'রে সহ্য করতে ইংলণ্ডস্থ ভারতীয়রা মোটেই রাজী হলেন না।

তাঁরা লণ্ডনের এক্সেটর হলে এক বিরাট সভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় চিত্তরঞ্জন দাশ হলেন প্রধান বক্তা। চিত্তরঞ্জন তখন যুবক। কিন্তু ভারতের বাঘের বিক্রম তখন তাঁর মধ্যে রয়েছে।

সেইদিনকার সেই সভায় বাঘের মতো বিক্রমশীল চিত্তরঞ্জনের বাগ্মিতায় সকলে খুবই বিস্ময় বোধ করল। ঐ যুবক যে ঐরূপ জোরালো বক্তৃতা দিতে সমর্থ হবে, এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

চিত্তরঞ্জন তাঁর বাগ্মিতার বলে ইংরাজকে বুঝিয়ে দিলেন, ভারত ভেতো মানুষের দেশ নয়, শ্বেত মানুষের দাসের দেশ নয়, ভারত আলোকময়—গুণময়!

ঐ দিনের পরেই, একদল ইংরাজের উদ্যোগে আবার ওল্ডহামে এক সভার ব্যবস্থা হল। ইংলণ্ডের তখনকার প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন হলেন সেই সভার সভাপতি।

চিত্তরঞ্জন নিমন্ত্রিত হয়ে, সেই সভায় বক্তৃতা দিলেন পূর্বোক্ত ইংরাজ ম্যাক্‌লীনের ভারত বিদ্বেষী মন্তব্যের বিরুদ্ধে।

সেই বক্তৃতা হল খুবই যুক্তিপূর্ণ।

চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তৃতা বলে প্রমাণিত করেছিলেন যে, ম্যাকলীন মিথ্যা কথা বলেছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সেইদিনকার সেই বক্তৃতায় ফল হয়েছিল, ম্যাক্‌লীন প্রকাশ্য সভায় ক্ষমা চেয়েছিল।

ম্যাক্‌লীন ছিল পার্লামেণ্টের সদস্য। কিন্তু সেই পদও তাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল তার সেই ভারতবিদ্বেষী বক্তৃতার জন্যই।

চিত্তরঞ্জন দাশের সেইদিনকার সেই বক্তৃতার প্রতিলিপি ইংলণ্ডের বহু পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

ইংরাজ তখন বুঝেছিল, ভারতের বনে বাঘ আছে, ভারতের মনেও আছে। ভারতের বনে আছে ব্যাঘ্র!

ইংরাজ তখন আরও বুঝেছিল, চিত্তরঞ্জন দাস যদি আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ভারতে গিয়ে উচ্চ সরকারী চাকরি লাভ করে, তা হলে, ইংরাজের কোনই লাভ হবে না। কারণ অমৃত যে ভারতের আম, সেই দেশের সন্তান চিত্তরঞ্জন হবে না ইংরাজের গোলাম!

চিত্তরঞ্জন এর পরে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিলেন কিন্তু উত্তীর্ণ হলেন না। কারণ ইংরাজী ধড়িবাজি তাঁকে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করল।

চাকরির চাকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত রইলেন।

পরবর্তী কালে চিত্তরঞ্জন কোন কোন সময়ে হাস্য করে বলতেন,

"I came out first in the unsuccessful list"—আমি পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলাম।

চিত্তরঞ্জন দাশ আই. সি. এস. হতে পারলেন না। তখন তিনি ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য "গ্রেস্-ইন্"-এ ভর্তি হলেন।

যথা সময়ে তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ বার-এট-ল।

চিত্তরঞ্জন ইংলণ্ড থেকে ফিরে এলেন ভারতে।

কলিকাতা হাইকোর্টে আরম্ভ করলেন আইনজীবির কাজ।

চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টার—চিত্তরঞ্জন বাগ্মী। চিত্তরঞ্জন রাজনীতিবিদ। চিত্তরঞ্জন স্বদেশ-সেবক। চিত্তরঞ্জন কবি। তাঁর জীবন আরও নানারূপ কর্মের ছবি।

চিত্তরঞ্জন খুব অল্পবয়সেই কবিতা রচনা করতেন; কবিতা আবৃত্তি করতেন; কবি ও কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথমে যে কবিতার বই প্রকাশিত করেন, তার নাম 'মালঞ্চ'। মালঞ্চ শব্দটির অর্থ—ফুলের বাগান। চিত্তরঞ্জনের চিত্ত উদ্যানে যে সকল কবিতা-কুসুম ফুটেছিল, তাদেরই কয়েকটি সেই "মালঞ্চ" মনুষ্য সমাজকে উপহার দিয়েছিল। যে ফুল ফুটেছিল চিত্তরঞ্জনের মন-মালঞ্চে, তাই প্রকাশিত হয়েছিল মালঞ্চে। মালঞ্চ প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।

॥ সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ ॥

চিত্তরঞ্জন ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লোক। ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন ভাব তাঁর বেশ ভাল লাগত; কোন কোন ভাব ভাল লাগত না।

ঈশ্বর সম্বন্ধে চিত্তের চিত্তের চিত্ত বিবেচনা করত, ঈশ্বর অজ্ঞাত—ঈশ্বর অজ্ঞেয়—ঈশ্বরকে জানা যায় না।

মালঞ্চ কাব্যপুস্তকে দেখা গেল, কতকগুলি কবিতায় ব্রাহ্মসমাজের

কোন কোন মতবাদের বিরুদ্ধ অভিমতই প্রকাশ পেয়েছে ; কোন কোন কবিতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞেয়তার কথাই বলা হয়েছে।

ঐরূপ হওয়ার ফলে, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সম্পর্ক একটু অমধুর হয়ে উঠল। সমাজের সঙ্গে যেন সংঘট ঘটতে লাগল।

॥ বন্দনীয়া বাসন্তী ॥

বাসন্তী—বাসন্তী হালদার।

বাসন্তী হালদার বরদাপ্রসাদ হালদারের কন্যা।

বরদাপ্রসাদ হালদার ছিলেন বিজনী রাজ-স্টেটের দেওয়ান।

চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে বাসন্তী হালদারের বিবাহ হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।

তখন বাসন্তী হালদার হলেন চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী বাসন্তী দাশ। বাসন্তী হয়ে আছেন মনুষ্য সমাজের বন্দনীয়া।

চিত্তরঞ্জন-বাসন্তীর বিবাহ তেমন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি।

না হওয়ার কারণ কি?

এক প্রকার সামাজিক রণ হচ্ছে তার কারণ। চিত্তরঞ্জনের মালঞ্চ পুস্তক প্রকাশের ফলে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের এক অমধুর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। সেইটিই হল সেই সামাজিক রণ।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই চিত্তরঞ্জন-বাসন্তীর বিবাহে যোগদান করতে চাইলেন না।

বিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পুরোহিত হওয়ার জন্য ব্রাহ্ম-আচার্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল।

কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

তিনি চিত্ত-বাসন্তীর বিবাহে অকার্যের কার্য সম্পাদন করলেন।

নগেন্দ্র তাঁর মনের ইন্দ্র-বলের, ইন্দ্র-ভাবের পরিচয় দিলেন।

।। আইনজীবী-জীবনের প্রথমে ।।

চিত্তরঞ্জন দাস কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেছেন। কিন্তু আয়-রোজগার বিশেষ কিছু হচ্ছে না—পসার জমছে না। এমন দিনও যায় যে একটি টাকাও সঙ্গে থাকে না। ট্রামের ভাড়াও থাকে না।

দুইবেলা প্রয়োজন কত পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য। তাও জোটে না।

সংসারে পরিজনও অনেক। তাঁদের ভরণ-পোষণ যেন আর চলছে না। তদুপরি, তাঁর পিতার ঋণভার যেন গুরুভার পাষাণের মতো তাঁর জীবনের উপর চেপে রয়েছে।

যারা টাকা পাবে, তারা টাকা চায়। তখন, ঋণ-পরিশোধ করতে না পেরে, চিত্তরঞ্জনের চিত্ত ভ'রে যায় দুঃখ বেদনায়।

চিত্তরঞ্জন তখন ভাবলেন, কি করা যায় ? কি করা যায় ?

নানারূপ ভেবে চিন্তে, চিত্তরঞ্জন স্থির করলেন, তিনি হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি না ক'রে, মফঃস্বলের কোর্টে আইনজীবীর কার্য করবেন।

তিনি করলেনও তাই। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মফঃস্বলের বিচারালয়ে আইনজীবীর কার্য করতে আরম্ভ করলেন।

এইবার তাঁর কিছু কিছু অর্থাগম হতে লাগল। একটু স্বচ্ছলতা দেখা দিল। কিন্তু পিতার ঋণভার ক্রমে ক্রমে এতই বেশী হয়ে পড়েছিল যে সে ঋণ পরিশোধ করার মত টাকা তাঁর রোজগার হচ্ছিল না।

উত্তমর্ণরা অর্থাৎ, ঋণদাতারা প্রায়ই চিত্তরঞ্জনের কাছে আসে, বিদ্রূপের হাসি হাসে, চিত্তরঞ্জনের চিত্তকে আক্রমণ করে কটুভাষে।

'টাকা দাও। টাকা দাও!' ক'রে যেন কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়। যেন শান্তি ও স্বস্তি শুষে নেয়।

ঋণভারে কাতর চিত্তরঞ্জন তখন ঋণদাতাদের পীড়ণ থেকে মুক্তি-লাভ করতে চাইলেন।

তিনি দেউলিয়া হওয়ার আইনের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

সে হচ্ছে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুনের ঘটনা।

চিত্তরঞ্জন হলেন দেউলিয়া।

পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য নিজের সবকিছুই দান করেছিলেন। সেই চিত্তরঞ্জন, ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে, ঐ সময়ে হলেন দেউলিয়া।

দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার ফলে, চিত্তরঞ্জনের সম্মানের হানি হতে লাগল সমাজে। তিনি বাধা বোধ করতে লাগলেন নানা কাজে—কিন্তু ঋণদাতারা যে তাঁর কাছে এসে তাঁকে জ্বালাতন করবে, সে ভয় আর রইল না।

কিন্তু ঋণ আর পরিশোধ করতে হবে না - ঋণদাতারা কোন ক্রমেই তাঁর নিকট থেকে টাকা আদায় করতে পারবে না,—এসব কথা ভেবে, চিত্তরঞ্জন খুসী হলেন কি ?—মোটেই না।

তিনি ভাবলেন, আমি যদি পরিশোধ না করি আমার পিতার গৃহীত ঋণ, তাহলে, আমি তো হয়ে থাকব হীন!—পিতার ঋণ পরিশোধ করাই আমার কর্তব্য হবে। সেই কর্তব্য আমি সম্পাদন করতে পারব কবে ?—কবে সে সুদিন আমার হবে ?

॥ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্ধু ভাবী দেশবন্ধু ॥

ভারত যখন ছিল ইংরাজের অধীন, তখন ইংরাজ-শাসক, ভারতের ক্ষতি করবার জন্য, বঙ্গদেশকে বিভক্ত করে দিয়েছিল।

ইংরাজের সেই অপকর্মের ফলে, ভারতে স্বরাজ্য লাভের জন্য বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল।

কয়েকখানি পত্রিকা সেই সময়ে বঙ্গদেশে নবজাগরণের বাণী প্রচার করতে লাগল, সেই সকল পত্রিকার নাম "বন্দে মাতরম্" "যুগান্তর". এবং "সন্ধ্যা"।

চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ সময়ে আইনজীবীরূপে দেশের মানুষের অনেক অনেক মঙ্গল সাধন করেন। ঐ সময়ে ইংরাজশাসক বঙ্গদেশে স্বাধীন-আন্দোলন দমন করার জন্য কয়েকটা মামলা দায়ের করেছিল।

"সন্ধ্যা" পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, এবং দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মামলায় জড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা' এবং 'আলিপুর বোমা মামলা'ও ইংরাজ, ঐ সময়েতেই দায়ের করে।

ঐ সকল মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করে, চিত্তরঞ্জন তাঁর আইন-জ্ঞান, দেশপ্রেম এবং নির্ভীকতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন।

"বন্দে মাতরম্"নামক পত্রিকাখানি ছিল ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহোদয় ঐ পত্রিকার বেশীর ভাগ ব্যয় ভার বহন করতেন।

বিপুল বিদ্বান অরবিন্দ ঘোষ হলেন ঐ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার কর্তা। বঙ্গদেশে সেই সময়ে অরবিন্দ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না।

।। শ্রীঅরবিন্দ ।।

অরবিন্দ পরবর্তীকালে বিশ্বজোড়া যশ অর্জন করেছেন। তাঁকে বলা হয় শ্রীঅরবিন্দ।

অরবিন্দের পিতার নাম কে. ডি, ঘোষ। তিনি ছিলেন চিকিৎসক। অরবিন্দের মাতার পিতার নাম রাজনারায়ণ বসু।

রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সাহিত্যিক, ছিলেন স্বদেশ-প্রেমিক, ছিলেন সমাজ নেতা, ধর্মনেতা।

ভারত স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট। অরবিন্দ জন্ম গ্রহণ করেন কলকাতায়, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট।

অরবিন্দের পিতা ডাক্তার কে. ডি: ঘোষ অরবিন্দকে অল্প বয়সেই ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। অরবিন্দ লণ্ডন নগরের সেণ্ট-পলস্ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করেন।

এরপর অরবিন্দ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। সেই পবীক্ষায় তিনি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন।

কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষায় তিনি তেমন যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারেন নি। তাই তিনি আই. সি এস.হতে না পেরে, কিংস কলেজে অধ্যয়ন করেন।

সেই কলেজ থেকে উচ্চ পরীক্ষা দিয়ে সগৌরবে উত্তীর্ণ হন।

অরবিন্দ যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, সেই সময়ে সেখানে ভারতের বরোদার মহারাজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বরোদার মহারাজা অরবিন্দের বিদ্যা, বিনয়, সাধুতা ইত্যাদির পরিচয় লাভ করে খুবই খুশী হন। বরোদার মহারাজা অরবিন্দকে বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। মাসিক বেতন স্থির হয় সাড়ে সাতশত টাকা। এ হচ্ছে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

অরবিন্দ যথাসময়ে ইংলণ্ড থেকে ভারতে আগমন করলেন। বরোদা কলেজের কার্যভার গ্রহণ করলেন।

অতঃপর বঙ্গভঙ্গ ও সে সম্বন্ধীয় আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখনকার পরাধীন ভারতের মুক্তিসাধনায় আত্মনিয়োগ করার জন্য অরবিন্দ বরোদা থেকে চলে আসেন বঙ্গদেশে। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি হন "বন্দে মাতরম্" নামক ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক।

"বন্দে মাতরম্" পত্রিকার ছিল একটি সম্পাদক মণ্ডলী। বিপিনচন্দ্র পাল, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন সেই সম্পাদক মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রগণ্য।

বিগত ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন, এবং ২৮শে জুলাই তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত দুইটি ইংরাজী প্রবন্ধ ইংরেজ-শাসক রাজদ্রোহিতা-মূলক বলে গণ্য করল। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম মুদ্রিত না থাকা সত্বেও, ইংরাজ শাসক স্থির করল, অরবিন্দ ঘোষই হচ্ছেন সেই পত্রিকার সম্পাদক। তারা অরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল।

অরবিন্দই যে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক, এই কথা প্রমাণ করার জন্য ইংরাজ শাসক পক্ষ বিপিনচন্দ্র পালকে মানল সাক্ষী।

বিপিনচন্দ্র পাল ইংরেজের বিচারালয়ে উপস্থিত হলেন। বিচারক তখন বিপিনচন্দ্রকে বললেন—সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্বে শপথবাণী উচ্চারণ করতে।

বরেণ্য বিপিনচন্দ্র পাল তখন কি করলেন? তিনি কি তাঁর স্বদেশের স্বার্থহানী করার জন্য বিদেশীর পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য দান করলেন?

না করলেন না।

তিনি বললেন, আমি এই মামলায় কোনরূপ সাহায্য প্রদান করতে ইচ্ছুক নই, শপথ বাণী উচ্চারণ করতে ইচ্ছুক নই। এই দুইটি কাজ করা আমার বিবেক সম্মত নয়।

আদালতের বিচারক তখন বিপিনচন্দ্রকে বললেন, আপনার এরূপ কার্যের ফলে আপনি ক্লেশের মধ্যে পতিত হবেন।

বিপিনচন্দ্র পাল মাতৃভূমির স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সেই বিচারকের সেই হুমকি গ্রাহ্য করলেন না। তিনি সাক্ষ্য দিলেন না।

তখন বিপিনচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা রুজু করল ইংরাজ সরকার।

সে হচ্ছে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্টের ঘটনা।

৪ঠা সেপ্টেম্বর সেই মামলার বিচার হল কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। সেই প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের নাম আর. এন. সিংহ।

বিপিনচন্দ্র পালের সেই স্বদেশপ্রেম ও নির্ভীকতা প্রদর্শনের মামলায় তাঁর পক্ষের ব্যারিস্টারের কাজ সম্পাদন করেছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ।

সেই মামলা পরিচালনে, চিত্তরঞ্জন দাশ সকলকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যে আইন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান কত গভীর, তাঁর বক্তৃতা-শক্তি কত বেশী, কত বেশী তাঁর নির্ভীকতা, কত বেশী তাঁর স্বদেশপ্রেম।

সেই মামলার বিচারক তাঁর রায় দিলেন ১০ই সেপ্টেম্বর।

বিপিনচন্দ্র পাল দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন—ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

স্বদেশের অনিষ্টকরণ কর্মে লিপ্ত না হয়ে, বিপিনচন্দ্র রইলেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মত।

।। দেশের বান্ধব ব্রহ্মবান্ধব ।।

ভারতেতে ইংরাজের রাজত্বের সন্ধ্যা
ঘটাতে চেষ্টিল ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'।

ভারত যখন ছিল ইংরাজের অধীন সেই সময়ে 'সন্ধ্যা' নামে একখানি বাঙ্গালা পত্রিকা ভারতকে স্বাধীনতার সন্ধান দান করতে অনলসভাবে প্রচার-কার্য্য চালাচ্ছিল।

ইংরেজের অধীন ভারতবাসী যাতে ভয়বিনাশী স্বাধীনতার বাঁশি বাজায়, সন্ধ্যা পত্রিকা সেইজন্য উৎসাহ দান করছিল।

সন্ধ্যা পত্রিকার কর্ণধার যিনি ছিলেন, তাঁর নাম ব্রহ্মবান্ধব

উপাধ্যায়। তাঁর প্রথম জীবনের নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে।

ভবানীচরণ প্রথমে হন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী।

তার পরে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তিনি তাঁর ভবানীচরণ নামটি পরিত্যাগ করলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করলেন।

ব্রহ্মবান্ধবের জীবন বৈচিত্র্যে ভরপুর।

তিনি "কঙ্কর্ড" নাম দিয়ে একখানি পত্রিকা পরিচালনা করেন। সেই পত্রিকা প্রকাশিত হয় তখনকার ভারতের সিন্ধুদেশে।

তিনি কলিকাতায় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার নাম "টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী" বা 'বিংশ শতাব্দী'।

ব্রহ্মবান্ধব ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানকার সুবিখ্যাত অক্সফোর্ড নগরে তিনি হিন্দুদের দর্শনশাস্ত্র এবং হিন্দুধর্মের নীতি প্রচার করে কয়েকবার ভাষণ দেন।

তাঁর সেই ভাষণ শ্রবণে ইংরাজ শ্রোতারা খুবই মুগ্ধ হন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ইওরোপ মহাদেশের নানা দেশে, নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ইওরোপে পর্যটন শেষে ব্রহ্মবান্ধব ফিরে আসেন কলিকাতায়।

দেশের বান্ধব ব্রহ্মবান্ধব তখন প্রায়শ্চিত্ত করলেন। তিনি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, আবার ব্রাহ্মণ হলেন।

তিনি এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করেছেন: "বিদ্যাসাগর কলেজে এফ. এ. ক্লাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমি তখন পড়ি।...সুরেন বাঁড়ুজ্যের লেক্‌চার শুনিয়া, দেশের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াছি, নিজের ভাবনা ছাড়িয়া পরের ভাবনা বড়ই মিষ্টি লাগে। ...মনে মনে স্থির করিলাম বিবাহ করিব না—বি-এ, এম-এ পাশ করিব না, প্রাণপণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিব।

আমার ঘর নাই—পুত্র-কলত্র কেহই নাই—আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে নর্ম্মদা নদী তীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া, সেই নিভৃত স্থানে ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে এ কি কথা শুনিলাম। ……কথাটি কি ? ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জন ধ্যান-ধারণার সময় নয়—সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে।……

বঙ্গভঙ্গের যুগে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশের-বান্ধব ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' নামক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

তারপরে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের একদিন ইংরাজের পুলিশদল উপস্থিত হল 'সন্ধ্যা' পত্রিকার কার্যালয়ে কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবকে তারা তখন পেল না।

একদিন সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব কলিকাতায় এক পত্র প্রেরণ ক'রে জানালেন, পুলিশ যদি 'সন্ধ্যা পত্রিকা'র কার্যালয়ে আগমন করে, তা হলে, তারা তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে।

সেই পত্র পেয়ে পুলিশ 'সন্ধ্যা কার্যালয়ে' এল, ব্রহ্মবান্ধবকে এবং পত্রিকার মুদ্রাকর হরিচরণ দাশকে গ্রেফ্‌তার করল। তাঁদের থানায় নিয়ে গেল। তবে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সেই দিনই দুইজনকে ছেড়ে দিল দশ হাজার টাকার জামিন নিয়ে।

অতঃপর, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে ব্রহ্মবান্ধবের বিরুদ্ধে মামল আরম্ভ হল। সেই ম্যাজিস্ট্রেটের নাম কিংসফোর্ড।

সেই মামলায় সাহসী দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন দাশ হলেন ব্রহ্ম-বান্ধবের পক্ষের ব্যারিস্টার।

ওদিকে, আদালতে মামলা অরম্ভ হওয়ার সময় তখন অতি সন্নিকট। অথচ ব্রহ্মবান্ধব তখন ও আসছেন না। তাই চিত্তরঞ্জন বেশ একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

ঠিক সেই সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় উপস্থিত হলেন সেইখানে। দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, 'আমি ইংরাজের আদলতের বিচার মানি না,—আমি আমার বক্তব্য লিখে এনেছি।

যে ইংরাজ করেছে ভারতের মানহানি, সেই ইংরাজের বিচার ভারত-সন্তান কেনই বা মানবে।'

সুবিপুল মানসিক বলশালী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর হাতের কাগজখানি পড়তে লাগলেন: "সন্ধ্যা" কাগজের প্রকাশকের, সম্পাদকের ও কার্য্যাধ্যক্ষের সমস্ত দায়িত্ব আমার; এবং আমি স্বীকার করিতেছি যে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে সন্ধ্যায় প্রকাশিত "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক আমিই কিন্তু আমি এই বিচার মানি না। কারণ, বিধিনির্দিষ্ট স্বরাজ দাবী কার্য্যের আমি যেটুকু কার্য্য করিয়াছি তাহার জন্য আমি—যে বিদেশীরা ঘটনাক্রমে আমাদের শাসন কর্তা হইয়াছে এবং আমাদের জাতীয় উন্নতি যাহাদের স্বার্থের বিরোধী—সেই বিদেশীর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নহি।"

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর সেই বাণীলিপি স্বহস্তে আদালতে উপস্থাপিত করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জন তাঁর নিকট থেকে মামলা সম্বন্ধে মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কোন কোন দিন রাত্রে ব্রহ্মবান্ধব, মামলা সংক্রান্ত পরামর্শের পর, চিত্তরঞ্জন ভবনেই অবস্থান করতেন। কিন্তু শয়ন করতেন ভূমিশয্যায়। বিছানা ব্যবহার করতেন না।

সেই মোকদ্দমাকালে ব্রহ্মবান্ধব রুগ্ন অবস্থায় কলিকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থান লাভ করেন। তাঁর দেহে অস্ত্রোপচারের পর, তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতিই হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর একজন সহকারী গ্রেফ্‌তার হওয়ার সংবাদ লাভ করে, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন

হয়ে পড়েন। তখন থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে, দেশের বান্ধব ব্রাহ্মবান্ধব পরলোক প্রাপ্ত হন।

ইংরাজের আদালত দেশের বান্ধব ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে মোকদ্দমায় মর্দন করবার জন্য আদা-জল খেয়েই লেগেছিল। কিন্তু 'সন্ধ্যা' সম্পাদকের জীবনসন্ধ্যা ইংরাজের সে সাধে বাদ সাধল।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

।। ভারতের অরি ও মুরারিপুকুর ।।

সেই যুগে ভারতের ইংরাজ শাসক ভারতের মানুষের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা দমন করার জন্য পরপর অনেকগুলো মামলাই রুজু করেছিল। আর চিত্তরঞ্জন দাশও আসামী পক্ষের আইনজীবীর কার্য করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। বিদেশী শাসকের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে, ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন আসামী পক্ষ সমর্থন করে, কি পেতেন? পেতেন শুধু প্রশংসা। অর্থ লাভ মোটেই হত না। অথচ সেই সকল,মামলা পরিচালনায় তাঁর পরিশ্রম হত প্রচুর।

ভারতে তখন পরাধীনতার অন্ধকার। আর ইংরাজ তখন ভারতের স্বাধীনতার অরি। ইংরাজ তার হাতিয়ারের বলে ভারতকে হাত ক'রে রেখেছে।

তাই ইংরাজের গুপ্তচর সর্বদাই নানা জায়গায় ঘুঘুর মত ঘুরত। ভারতের সন্তানেরা কোথায়, কিরূপে ভারতের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করছে, তারা সন্ধান করত।

ভারতের স্বাধীনতা-অরি ইংরাজ-শাসকের গুপ্তচর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে কলিকাতার মুরারিপুকুর অঞ্চলে একটি বাগানে হানা দিল। ভারতের সেবক সন্তানদের বোমা তৈরীর সন্ধান পেল।

তখন সেই গুপ্তচরেরা কলিকাতার আরও কয়েক স্থানে হানা দিল, প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য এবং পুস্তকাদির সন্ধান লাভ করল।

তখন তারা স্থির করল, অরবিন্দ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি ঐ রাজদ্রোহিতার কার্যে লিপ্ত আছে।

ইংরাজ শাসক উক্ত তিন জন সহ মোট ৩১ জনকে বিপ্লবী ব'লে অভিযুক্ত করল।

ভারতের সেই সুসন্তানদের তারা উপস্থিত করল কলিকাতার আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে। সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম বার্লি।

এই যে মামলা হল, এই মামলাকেই বলা হয় 'আলিপুর বোমার মামলা'। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই হচ্ছে এক অভিরাম অধ্যায়।

সেই মামলা চালানোর জন্য চাঁদা সংগ্রহ হয়েছিল ২৪ হাজার টাকা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সেই অর্থের অর্ধেক অপেক্ষাও অধিক ব্যয়িত হয়ে যায়। মামলা চলবে বহুদিন ধরে। তার ব্যয় নির্বাহ হবে কি ক'রে, এই হল বিপ্লবীদের পক্ষের সমস্যা।

আসামীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য কাকে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা যায়, এই হল আসামীদের আপনজনদের ভাবনার বিষয়।

॥ পরলোক থেকে ব্রহ্মবান্ধবের বার্তা ॥

সেই আলিপুর বোমার মামলার যুগে কলিকাতায় একজন এটর্ণী ছিলেন। তিনি হচ্ছেন পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কুমারকৃষ্ণ দত্ত। তিনি চলে গেলেন কারাগারে অরবিন্দের নিকট পরামর্শ চাইবার জন্য।

কুমারকৃষ্ণকে বললেন অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ আমার পক্ষের আইনজীবীর কার্য করুন, এইটিই আমার ইচ্ছা।

কিন্তু এর পূর্বে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং হেমেন্দ্রকুমার ঘোষ চিত্তরঞ্জনের নিকট গিয়েছিলেন। অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করার জন্য তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, অরবিন্দ ঘোষ কি কেবল আপনাদেরই আপনজন? তিনি কি আমার কেউ নন? আমি অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করব।

ঐ ঘটনার পরে কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহোদয় উপস্থিত হলেন চিত্তরঞ্জনের কাছে। অনুরোধ করলেন অরবিন্দের পক্ষের ব্যারিষ্টারের কাজ করবার জন্য।

চিত্তরঞ্জন তখন হর্ষবিকশিত চিত্তে ব'লে উঠলেন, উপাধ্যায় আমাকে ব'লেছেন, এই মামলা পরিচালনা আমিই করব।

'উপাধ্যায়' শব্দটি শ্রবণ করা মাত্র, কুমারকৃষ্ণ অবাক হয়ে উঠলেন, বললেন 'উপাধ্যায়' কে?

চিত্তরঞ্জন সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, উপাধ্যায় সেই সে—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। পরলোকে থেকেও যাঁর বার্তা এসে ইহলোকে পৌঁছায়।—আমি স্পিরিট এনেছি প্লানচেট সাহায্যে।

একদিন স্পিরিট এল—অরবিন্দের মামলা তোমাকেই করতে হবে,—এই কথা বার বার বহুবারই লেখা হল।

সেই লেখা কে লিখছেন,—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হল: আমি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

উপাধ্যায়ের বাক্য যেন আমাদের উপাধ্যায়ের বাক্য ব'লে মনে হয়, বললেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়।

॥ বৃটিশের বুকে বোমা—আলিপুর বোমার মামলা ॥

মুরারিপুকুর বোমার মামলার বিচার হয়েছিল কলকাতার আলিপুর আদালতে। তাই সাধারণত ঐ মামলাকে বলা হয় 'আলিপুর বোমার মামলা'। সেসন আদালতে মামলা আরম্ভ হল ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর।

ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ সেই মামলায় অরবিন্দের পক্ষের আইনজীবীর কার্য করলেন। তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত হলেন ১৭ই নভেম্বর।

স্বদেশের সন্মান রক্ষা করার জন্য, স্বদেশভক্তদের মামলার জাল থেকে মুক্ত করার জন্য, চিত্তরঞ্জন সেই মামলা পরিচালনা কার্যের জন্য কঠোর-পরিশ্রম করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বিচারকের সম্মুখে অরবিন্দকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করলেন।

তাঁর সেই যুক্তিজালের মধ্যে তাঁর সুগভীর আইন-জ্ঞান ও বাগ্মিতা প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি তাঁর সেই কার্য দ্বারা জুরি এবং বিদেশী বিচারকেরও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করে, চিত্তরঞ্জন তখন বিচারালয়কে বলেন : "এক্ষণে আপনার নিকট আমার নিবেদন,—এইরূপ একজন পুরুষ—যে অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কেবল এই কোর্টের সম্মুখে নয়, হাইকোর্টেরও বিস্তৃত ইতিহাসে এই প্রথম বিচারাপেক্ষায় দণ্ডায়মান। সুতরাং আমার নিবেদন এই যে—এই গণ্ডগোল মিটিয়া যাইবার বহু পরে, এই ঝড় থামিয়া যাইবার, এই আলোচনা বন্ধ হইবার পরেও, তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হইবারও বহু পরে তাঁহাকে লোকে দেশহিতৈষণার কার্য বলিয়া জাতীয়তার অগ্রদূত বলিয়া, মানব-প্রেমিক বলিয়া

স্মরণে রাখিবে। তাঁহার মৃত্যুর পরে—বহুপরে, তাঁহার বাণী—কেবল ভারতে নহে, সুদূর সমুদ্র পারে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইবে।

তাই আমি বলিতেছি, তাঁহার মত একজন লোক কেবল এই কোর্টের সম্মুখে নয়, হাইকোর্টেরও সম্মুখে ইতিহাস-প্রসিদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আপনার এইবার দণ্ডাজ্ঞা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। আর আপনাদেরও মত প্রকাশের সময় আসিয়াছে।

ইংলণ্ডের ইতিহাসের সর্ব্বোজ্জ্বল অধ্যায়, ইংরাজের বিচারালয়ের সমস্ত রীতিনীতির নামে আমি নির্বেদন করিতেছি, যাহা মহৎ তাহার নামে নিবেদন করিতেছি, বিলাতের বিচারালয় হইতে আইনের মূল তথ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহার নামে আবেদন করিতেছি।

ইংলণ্ডের যে সমস্ত বিখ্যাত বিচারক এমন ভাবে আইনের প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহা দ্বারা মোকর্দ্দমা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ সন্তুষ্টচিত্তে বিচার গ্রহণ করিয়াছে—সেই সমস্ত স্বনামধন্য বিচারকগণের নামে প্রার্থনা করিতেছি, এবং আরও বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডের ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলির নামে আজ নিবেদন করিতেছি যে, কেহ যেন ভবিষ্যতে না বলিতে পারে যে একজন জজ ইংরাজ হইয়াও সুবিচার করিতে পারেন নাই।

আর এই ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনাদেরও বলি, অরবিন্দ যে আদর্শ জনসাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, সেই আদর্শের নামে—দেশের রীতিনীতির নামে—আজ আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, ভবিষ্যতে যেন এমন কোন সমালোচনা শুনিতে না হয় যে, তাঁহার দুইজন স্বদেশ-বাসী উত্তেজনা ও সংস্কারের বশবর্ত্তী ইহয়া কার্য করিয়াছিল,—সাময়িক উত্তেজনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপনাদের কার্য্য পন্থা নিরূপণ করিয়াছিল।”

॥ দণ্ডাদেশ ঘোষণার দণ্ড ॥

এইবার আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের দণ্ডাদেশ ঘোষণার সেই দণ্ড এসে গেল।

বিভিন্ন শ্রেণীর বহু লোকদ্বারা আদালত কক্ষ তখন পরিপূর্ণ। বিচারকের রায় শোনার জন্য আগ্রহে লোকের হৃদয় পরিপূর্ণ।

বিদেশী বিচারক ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি দুইজন আসামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলাম ; দশজন আসামীকে যাবজ্জীবন দীপান্তরবাস দণ্ড ভোগ করতে হবে ; তিনজন আসামী দীপান্তরে বাস করবে দশ বছর ; তিন জন আসামী দীপান্তরে বাস করবে সাত বছর ; একজন আসামী সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করবে এক বছর ; আমি সতের জন আসামীকে বেকসুর খালাস দিলাম।'

অরবিন্দ ঘোষ প্রমাণিত হলেন নির্দোষ। কিন্তু তার প্রতি রইল ভারত-বিদ্বেষী বিদেশী শাসকের রোষ।

দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত, এবং বেকসুর খালাস সকল স্বদেশ-সেবক তখন শোভমান হলেন ঠিক যেন পাবক।

॥ আলিপুর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল ॥

আলিপুর আদালতের কড়া রায়ের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করা হোল। সেখানেও আসামীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য উপস্থিত হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

চিত্তরঞ্জনের ব্যারিস্টারি বুদ্ধির বলে, হাইকোর্টে উক্ত আসামীদের দণ্ড হ্রাস পেল।

বিদেশী জেংকিন্স সাহেব তখন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক। তিনি ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের প্রশংসা না করে পারলেন না। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন ঃ ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের প্রশংসা না করে পারছি না,—তিনি প্রতিভাবান পুরুষ।

॥ ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ॥

বিদেশী বৃটিশ-শক্তি ভারতকে পদানত করে রাখবার এবং তাদের শোষণযন্ত্র চিরস্থায়ী করার জন্য উদ্ভাবন করতে লাগল নিত্য নূতন ষড়যন্ত্র।

তারা এইবার 'ঢাকা ষড়যন্ত্র' নাম দিয়ে আর এক মোকদ্দমা রুজু করল। ভারত-ভক্তদের দমন করাই হচ্ছে সেই মোকদ্দমার উদ্দেশ্য। এইবার এখনকার বাংলাদেশের এবং তখনকার ভারতের ঢাকা শহরকে বলা হল সেই ষড়যন্ত্রের স্থান।

প্রচুর প্রশংসনীয় পুলিনবিহারী দাস একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। এই সমিতির নাম 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'।

পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সমিতির শাখা। তখনকার পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য কাজ করাই ছিল সেই সকল সমিতির উদ্দেশ্য।

বিদেশী বৃটিশ-রাজ স্থির করল, ভারতকে স্বাধীন করার কাজে বাধা দিতে হবে।—তাই তারা মোকদ্দমা রুজু করল। আসামী করা হল ৪৪ জন ভারত-সেবককে। মামলা আরম্ভ হল ঢাকা সেসন আদালতে।

এই মোকদ্দমায় আসামীদের পক্ষের ব্যারিস্টার নিযুক্ত হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ; ইংরেজ সরকারের পক্ষের ব্যারিস্টার হলেন গার্থ।

এই মোকদ্দমায় কোন কোন আসামী আদালতে বললেন, অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই।

কোন কোন আসামী বললেন, অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ রয়েছে বটে ; তবে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করা এই সমিতির উদ্দেশ্য নয় ; এই সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙ্গালীদের শরীর ও মন সবল করে তোলা।

চিত্তরঞ্জন আদালতে আসামীদের পক্ষ সমর্থন করে সওয়াল করলেন প্রায় একমাস কাল। তাঁর সেই সওয়াল হল সকলেরই শোনবার মতো।

আসামীদের মধ্যে ৩৬ জন দণ্ডলাভ করলেন ; ৮ জন মুক্তি লাভ করলেন।

'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা'র রায়ের বিরুদ্ধেও কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করা হোল।

সেই আপীলের বিচারক হলেন তিনজন ঃ হ্যারিংটন, মুখোপাধ্যায় এবং ক্যাস্‌পার।

স্বদেশ-ভক্ত আসামীদের পক্ষ সমর্থন করলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন।

একজন আসামীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে গিয়েছিল। তাই তিনি আপীল করতে সমর্থ হননি। সেই আপীলের ফলে মুক্তিলাভ করেছিলেন ২১ জন আসামী।

॥ মামলা—কেবলই মামলা ॥

ইংরাজ সরকার ভারত-ভক্তদের শায়েস্তা করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল।

তারা 'মুসলমান পাড়া বোমার মামলা' নামে আর এক ষড়যন্ত্র মামলা তৈরী করল। সেই মামলায় আসামীদের পক্ষে ছিল ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের বিপুল চেষ্টা।

ইংরাজ সরকার ভারত-ভক্তদের দমন করবার জন্য তাঁদের মধ্যে

কয়েকজনকে রেখে দিয়েছিল কুতুবদিয়া নামক এক পল্লীগ্রামে। বৃটিশের বিদ্বেষ-সর্পের সঙ্গে সঙ্গে সে গ্রামে বিষধর সর্পের উপদ্রবও ছিল খুবই বেশী। আরও বহুরকম উপদ্রবও ছিল সেখানে।

তাই আসামীরা সেখান থেকে গোপনে চলে গেলেন।

ইংরাজ সরকার সেই সকল ভারত-ভক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করল। সেই মামলাতেও আসামীদের পক্ষের ব্যারিস্টার হলেন সেই সহৃদয় পুরুষ চিত্তরঞ্জন দাশ।

॥ অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা ॥

ইংরাজ সরকার অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উত্থাপন করল, মামলা করল।

আসামী পক্ষে ব্যারিস্টার হলেন নামকরা আইনজ্ঞ পুরুষেরা—ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, নর্টন, জ্যাক্‌সন প্রভৃতি।

তাঁরা আইনের তর্কের জটিল জাল বিস্তার করতে লাগলেন। কিন্তু আদালতের বিচারকেরা সেই সকল যুক্তি যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে করছেন ব'লে বোধ হলো না।

আইনজ্ঞ জ্যাক্‌সন দেখলেন, তাঁর সারবান যুক্তিগুলোকে বিচারকেরা যেন অসার ব'লে মনে করছেন।

জ্যাক্‌সন তখন বিরক্তি বোধ করলেন। তিনি প্রধান বিচারককে দু'-চারটা অপ্রিয় কথা ব'লে ফেললেন। তারপর বিচার ঘর থেকে চলে গেলেন।

তখন দণ্ডায়মান হলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। অমৃত বাজারের পক্ষে সমর্থন করে তিনি যা বললেন, অনেকেরই মনে হল্ তা যেন অমৃতেরই মতো।

॥ ডুমরাওন রাজার মোকদ্দমা ॥

ডুমরাওন রাজার মোকদ্দমায়, ডুমরাওন রাজের পক্ষে প্রথমে আইনজীবী নিযুক্ত হয়েছিলেন বোম্বাইয়ের এডভোকেট জেনারেল। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ পুরুষ।

কিন্তু মোকদ্দমা চালাতে চালাতে, তিনি লক্ষ্য করলেন, তিনি হয়তো ডুমরাওন রাজাকে মোকদ্দমায় জয়লাভ করাতে পারবেন না।

ঐরূপ অবস্থায়, তিনি আর রাজার পক্ষের আইনজীবীর কাজ করতে ইচ্ছা করলেন না। তিনি প্রস্থান করলেন।

ডুমরাওন রাজার পক্ষে তখন সত্যই খুব বিপদ উপস্থিত হল।

কাকে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা যায়, এই হল রাজার পক্ষের চিন্তার বিষয়। তাঁরা কলিকাতার বড় বড় ব্যারিষ্টারের কাছে গেলেন। তাঁদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু কাউকে রাজী করাতে পারলেন না তাঁরা।

অনেকেরই তখন ধারণা হয়েছিল যে, বিচারালয়ের বিচারক মহোদয় ডুমরাওন রাজের জয় সমর্থন করেন না। তাই কোন ব্যারিষ্টারই রাজার পক্ষ সমর্থন করতে চাইলেন না।

রাজার পক্ষের লোক তখন উপস্থিত হলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের নিকট। চিত্তরঞ্জন সেই মামলা পরিচালনা করতে সম্মত হলেন। বহু ব্যারিস্টার যে কাজে হলেন পরাজয় ভয়ে ভীত, সেই কাজে চিত্তরঞ্জন হলেন অগ্রসর। সেই মোকদ্দমাতেও চিত্তরঞ্জন তাঁর পূর্বেকার সুনাম আরও বৃদ্ধি করতে সমর্থন হলেন। তিনি যে কত বড় ব্যারিস্টার, তা বুঝতে বাকী রইল না কারুরই আর।

তখনকার আইনজীবী চিত্তরঞ্জন দাশ অনেক আসামীর জীবন রক্ষা করেছিলেন ; অনেক আর্ত ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করেছেন, পরার্থ সাধনের সেরা দৃষ্টান্ত তিনি কত বারই দেখিয়েছেন।

॥ বিলাতীদ্রব্য বর্জন ও স্বরাজ অর্জন উদ্যোগ ॥

ভারত তখন ইংরাজ সরকারের অধীন। কিন্তু ভারতকে স্বাধীন করবার প্রবল প্রচেষ্টাও ভারতীয়দের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য ভারত-ভক্তদের প্রাণ তখন নাচছে ; ভারতভক্তেরা অগ্নির পথে যাচ্ছেন।

ইংরাজ সরকারও ভারতকে তাদের অধীনে রাখবার জন্য নানা-রকম কাজই করছিলেন। সেই কাজগুলোর মধ্যে একটা কাজ হল বঙ্গভঙ্গ—পূর্ববঙ্গকে এবং পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক করা।

বাঙ্গালী জাতিকে দুর্বল ক'রে বাঙ্গালীকে কাঙ্গালী ক'রে ফেলা, এবং পূর্ববঙ্গে মুসমানদের আধিপত্য প্রবল ক'রে তোলাই ছিল ইংরাজ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য।

সমগ্র দেশের মধ্যে ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হতে লাগল। বাঙ্গালীদের অনুষ্ঠিত শত শত সভা-সমিতি ঘোষণা করল ঃ বঙ্গভঙ্গ কাজটা ইংরাজের ভীষণ একটা দুর্নীতি।

বাঙ্গালীদের মনে তখন আর ইংরাজ-ভীতি রইল না।

কলিকাতা শহরের টাউন হলে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হল ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট। সেই সভায় সভাপতি হলেন বহু সুকর্মের কর্তা কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়। মনীন্দ্রের মন ছিল ইন্দ্রের মতো—মহান।

ভারতের লোক বিলাতী জিনিস কিনবে না, বিলাতী দ্রব্য বর্জন করবে,—এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হল নির্ভীক মানুষদের সেই সভায়।

দেশের সর্বত্র শোনা যেতে লাগল গান ঃ 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।'

বিলাতী জামা-কাপড় পুড়িয়ে ফেলা হতে লাগল। ভারতের সন্তানদের ভেতরের শক্তি-আগুন জ্বলল।

॥ রাখীবন্ধন ॥

ইংরাজ সরকার এক ঘোষণা প্রচার করল, ১৬ই অক্টোবর 'পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ আর এক সঙ্গে থাকবে না, আলাদা হয়ে যাবে'।

বাঙ্গালীরাও তখন ব'সে রইলেন না। তাঁরা প্রচার করলেন, ১৬ই অক্টোবর—৩০শে আশ্বিন থেকে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মন আরো বেশী মিলনসূত্রে আবদ্ধ হবে। সমগ্র বাংলাদেশে বাঙালী তখন সম্পন্ন করলেন "রাখীবন্ধন"—রক্ষাবন্ধন অনুষ্ঠান।

হাজার হাজার বাঙ্গালী সেদিন গঙ্গাস্নান করলেন, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তুললেন, সকলে পরস্পরের হাতে রাখী বন্ধন করলেন, আর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত কবিতা :

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান !

॥ রাজনীতি ক্ষেত্রে মহারাজরূপে বিরাজের সূচনা ॥

তখন চলতে লাগল সমগ্র বঙ্গে স্বরাজ অর্জন আন্দোলন। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সবল-দুর্বল, নারী-পুরুষ, সকলেই যথাসাধ্য স্বদেশ-সেবায় মত্ত হয়ে উঠলেন, ইংরাজের বন্দুকের ভয় টুটলো।

ঐ সময়ে চিত্তরঞ্জন ছিলেন দুর্জয়লিঙ্গে বা দার্জিলিংয়ে। সেখানে হিন্দুহল ভবনে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন!

স্বদেশী আন্দোলন, স্বরাজ অর্জন, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, ইত্যাদিই হল সেই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পরবর্তী কালে চিত্তরঞ্জন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মহারাজরূপে বিরাজ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধ দিয়েই হয়েছিল তাঁর সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামী জীবনের আরম্ভ।

॥ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে চিত্তরঞ্জনের প্রবন্ধ ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংয়ে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, সেটি এইরূপ :— "আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক অতি-বিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই নূতন জীবনসঞ্চার—যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশে একমাত্র মুক্তির কারণ হইয়া উঠিবে।

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র উপায়, এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে।

জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের অঙ্গমাত্র, সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এবং একথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এই দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না। কিন্তু এই যে নবজীবন সঞ্চারিণী আশা—যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্য-বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদিগকে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙ্গালীজাতির শ্রবণ বিবরে এক আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব স্বাধীনতা সঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না?

আমার কাছে এই নব-আন্দোলন যে যে কারণে সর্ব্বাপেক্ষা

বাঞ্ছনীয় তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা ফলত ও মূলত বাঙ্গালী জাতির আত্মনির্ভরতার পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই কারণেই আমাদের ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে। জগতের ইতিহাসে বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে ধরিয়া স্বাধীনতা তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তি আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হইবে। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনও মিলিবে না।

আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজ আমাদিগের সকল দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের সকল লজ্জা নিবারণ করিবে এবং আমাদিগকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সে কথা যদিও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে, একদিন আমরা ইংরাজের বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধুমাত্র তাহার মুখের কথার উপরে আমাদের সকল আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম।

তাহার যথাযথ কারণও ছিল। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল।

একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, কেবল মাত্র মৌখিক মন্ত্রের আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিবশক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, অপরদিকে যে অপূর্ব প্রেমধর্মবলে মহাত্মা শ্রীচৈতন্য সমস্ত বাঙ্গালাদেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র মালা জপাইতেই

নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল, আর আমাদের সমগ্র ধর্মক্ষেত্র শক্তিহীন, শক্তি ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

তখন নবদ্বীপের চির-কীর্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী, বাঙ্গালীর জীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপ কি ধর্মে, কি জ্ঞানে বাঙ্গালী তখন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি বাঙ্গালীর বলবীর্য পর্যন্ত তখন নিতান্ত কৃতঘ্নের মত সমস্ত বাঙ্গালী জাতির গলদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে ব্যস্ত ছিল।

এমন সময়ে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক বেশে আগমন করিয়া আমাদের এই জাতীয় দুর্বলতাকে আশ্রয় করিয়া দুই-এক দিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপনপূর্বক আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিল। আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আমরা শুধু ইংরাজের রাজত্বকে নয়, সমগ্র ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে দুই হাতে আকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই দুর্বলতার জন্যই বোধহয় আমাদের চক্ষু ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারে নাই। আমরা একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময় ও মোহবশত আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া সেই পথেই অগ্রসর হয়. আমরা ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, আমাদের নিজের সাহিত্যের প্রতি একেবারে দৃক্‌পাত না করিয়া, আমাদের নিজের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া, ইংরাজের

সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ধাবমান হইয়াছিলাম।

ইংরাজের ইতিহাস আমাদের ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের রাজনৈতিক সাহিত্যের সহিত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমরা মোহ-মুগ্ধ হইয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, ইংরাজের ইতিহাস ইংরাজেরই জাতীয় জীবনের প্রতিভা, আমাদের নহে। ইংরাজের সাহিত্য ইংরাজেরই জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পারে, তাহার সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই।

ইংরাজের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে আমাদের মাথার দৈন্য কিছুতেই ঘুচে না ও ইংরাজের গৌরবে আমাদের লজ্জা কিছুইতেই নিবারণ হয় না। ইহা অতি সোজা কথা—অত্যন্ত সরল সত্য, কিন্তু সমস্ত জাতীয় জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হইলে বোধহয় এমনই করিয়া অতিশয় সরল সত্য অত্যন্ত দুর্বোধ হইয়া উঠে।

এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজের ক্ষমতা দেখিয়া আত্মজ্ঞান হারাইতেছিলাম, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়তই প্রতারিত হইতেছিলাম, ইংরাজের কথার উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। যে Proclamation (প্রোক্লামেসন—ঘোষণা) লইয়া এত গর্ব করি এবং কথায় কথায় যাহার দোহাই দেই তাহার মধ্যে যে কোন অন্ধকার কোণে আমাদের সকল আশা ভরসাকে উপেক্ষা করিবার জন্য "So far as it may be" এই বাক্যময় শানিত ছুরিকা লুক্কায়িত ছিল, তাহা একেবারে অনুভব করিতে পারি নাই।

Curzon বাহাদুরকে ধন্যবাদ দি, তিনি সেদিন আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন,…আমরাও ভাল করিয়া Proclamation-এর গূঢ় তত্ত্ব মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। জগদীশ্বর

আমাদের সহায় হউন—এই সত্য জ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে।

আর আমরা ভুলিয়াছিলাম ইংরাজের Pax Britanica—ইংরাজ রাজনীতি হইতে উৎপন্ন এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় মহাশান্তি। এই মহাশান্তির প্রসাদে আমরা গ্রামে গ্রামে গোয়েন্দারূপে পঞ্চায়েত, শহরে শহরে অতি ধীর শান্ত বহু শিষ্টাচার সম্পন্ন লাল পাগড়ীওয়ালার কোমল-করুণ হুলের স্পর্শে সর্বদাই শান্তিরসে নিমগ্ন, জেলায় জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের দল আমাদের শান্তির উপায় অন্বেষণ করিতে সদাসর্বদা ব্যস্ত হইয়া চাবুক হস্তে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং ডিভিসনে ডিভিসনে 'ডিভিসন' কমিশনার বৃন্দ এই অদ্ভুত শান্তিপূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছেন, আর রাজধানীতে—কখনও বা শৈলশৃঙ্গে—ইহাদের হর্ত্তাকর্তা বিধাতা অতিশয় শ্রম-শ্রান্ত বহু ভারাক্রান্ত ঘর্মাক্ত-কলেবর আমাদের ছোট লাটবাহাদুর দ্বিতীয় নেপোলিয়নের ন্যায় নৃত্যসভায় পর্য্যন্ত সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে কি করিয়া এই বাঙ্গালী জাতির শিরায় শিরায় এই মহাশান্তির অহিফেন প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, সেই ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছেন।

হায় রে ব্রিটিশরাজ্যের শান্তি! হায় আমরা অভাগ্য! আমরা এত দিন বুঝিতে পারি নাই যে, এই দেশব্যাপী নিছক শান্তি আমাদের জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিবার উপায় মাত্র। ইহা যদি শান্তি হয়, ইহা যে মৃত্যুর শান্তি। ইহার উপরে কোন দিন কোন কালে জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আজ ভগবৎপ্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণচ্ছায়ারূপী এই মহামায়া কুহেলিকা অপসৃত হইয়া গিয়াছে। এই নবন্মোষিত জাতীয়ত্বের প্রভাতালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর-পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ

আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবুর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ বর্ণিত শীর্ণকায় কুকুরের মত শুধু করুণ নেত্রে ও প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরাজের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরাজ তাহার পাতের মাছের কাঁটাখানি উত্তমরূপে চুষিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট হয়, এমন কিছুই দিবে না।

আর বিধাতা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আপনার চরণে ভর করিয়া আপনি না দাঁড়াইতে পারিলে কোনদিন আমাদের শক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না। সেইজন্যই আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই নব আন্দোলন আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

কিন্তু আমাদের চিরকালের ভাগ্যহীনতা এইক্ষণেও আমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। আমাদের দেশে এই সময় তর্কশাস্ত্র আশ্চর্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং যদিও এখন আর তর্কশাস্ত্রের সেই উন্নত অবস্থা নাই তথাপি আমাদের দুরদৃষ্টবশত নিষ্ফল তার্কিকের কোন অভাবই পরিলক্ষিত হয় না। উপহাস রসিকেরও প্রাদুর্ভাব কম নহে। আমাদের শুষ্ক স্বদেশপ্রেম-বর্জ্জিত হৃদয় হইতে দুই একটা শাণিত বাক্য কটাক্ষ নিক্ষে করিয়া অতিশয় বিজ্ঞতার ভান করিয়া আপনারা সুখে অস্থির হইয়া উঠেন। কিন্তু সেই তর্ক ও সেই উপহাস মাতার আহ্বানকে কিছুতেই ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হয় না।

আজিকার দিনে এই দেশব্যাপী আন্দোলনে শত-লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্" ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্ত হতভাগ্য। আর যে ডাক শুনিয়াছে কিন্তু শুনিয়াও আপনার ছোট ছোট স্বার্থগুলিকে সম্মুখে ধরিয়া আপনার মস্তিষ্ক হইতে আকৃষ্ট মিথ্যা তর্করাশি এবং আপনার করুণাবর্জ্জিত

হৃদয়জাত শুষ্ক তুচ্ছ উপহাসের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সে সরকারী উকিলই হউক, কি ছোট কি বড় রঝমের সরকারী জুজুই হউক, কি সামান্য কেরাণী কি সামান্যতর ক্লার্কই হউক,—সে মাতা ও বিধাতার অপমান করিতেছে—সে মাতৃদ্রোহী! সে ঈশ্বরদ্রোহী! তুষানলেও তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

তার্কিকেরা ও উপহাস রসিকেরা যাহাই বলুক, তাহাতে আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার কোন কারণ নাই। আমরা মায়ের ডাক শুনিয়া অগ্রসর হইয়াছি, আমরা কি দুটা নিষ্ফল তর্ক ও নিষ্ফলতর উপহাস শুনিয়া ফিরিয়া যাইব? বিধাতার অমোঘবাণী আমাদের অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে, আমরা শত তর্ক, শত যুক্তি, শত সহস্র উপহাস অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া বিধাতার বাণীকে শিরোধার্য্য করিয়া বিধাতৃনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইব। আর অধিক পরিষ্কার দেখিতেছি যে, অচিরে আমাদের এই নব আন্দোলন ফলবান হইয়া তার্কিককে লজ্জিত করিবে ও উপহাস রসিককে উপহাসযোগ্য করিয়া তুলিবে।"

॥ কংগ্রেসে যোগদান ॥

ইংরাজের অধীন ভারতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতি বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলিকাতায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন সেই অধিবেশনে যোগদান করলেন।

কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে সভাপতি হলেন ভারতের সুসন্তান দাদাভাই নৌরজী।

তিনি তাঁর অভিভাষণে ঘোষণা করলেন,—ভারত স্বরাজ চায়, স্বরাজ ভারতের পাওয়া প্রয়োজন।

তারপর বিষয়-নির্ধারণ সমিতির অধিবেশন বসল। সেখানে বর্জন বা বয়কট প্রস্তাব প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নবীন বা জাতীয় দল প্রবীণদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তারা সমিতির অধিবেশন স্থান থেকে চলে গেলেন।

তাঁরা চিত্তরঞ্জনের রসারোডস্থিত বাসভবনের পাঠাগারে মিলিত হলেন। নিজেদের কর্তব্যপন্থা সব কিছু স্থির করতে লাগলেন।

।। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় সমিতির সভাপতি ।।

কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। সেই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ হলেন সভাপতি।

তিনি যে অভিভাষণ দিলেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে "বাঙ্গলার কথা"। তাঁর সেই অভিভাষণে তিনি তাঁর রাজনীতিজ্ঞানের বিপুল পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি তখন সমগ্র দেশকে সম্বোধন করে ব'লেছিলেন—

"এস, এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র, এস, এস, সবাই এস!... বল বন্দেমাতরম্!"

দেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞের পুরোহিত বা হোতা প্রচার করেছিলেন যে "বাঙ্গলার কথা", সেইটিই দেশের মর্ম-কথা।

।। ভারতের ভালো করার ভাবনা ।।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারত সৈনিক এবং অর্থ ইত্যাদি দিয়ে নানারূপে ইংরেজের সাহায্য করেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, ভারতবাসী ইংরাজের নিকট বেশী করে রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু ইংরাজ তা প্রদান করতে ইচ্ছুক ব'লে দেখা গেল না।

বাল গঙ্গাধর তিলক এবং এনি বেশান্ট ভারতের দাবি ঘোষণা করে নানারূপ বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তার ফলে ইংরাজ সরকার খুবই অসন্তুষ্ট হল।

পুণার জেলাশাসক তিলকের প্রতি আদেশ দিলেন যে, তাঁকে ৪০ হাজার টাকা মুচলেকা দিতে হবে।

এনি বেশান্টকে নির্বাসিত করা হল দক্ষিণ ভারতের উৎকামণ্ডে।

ভারত-ভক্ত দুই ভাই মহম্মদ আলী এবং সৌকত আলিও নির্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত হলেন।

বঙ্গদেশের এক হাজারের চেয়েও বেশী দেশভক্ত সন্তানও নির্বাসন লাল করলেন।

ইংরাজ সরকারের ঐ সকল ভারত-বিরোধী কার্যের ফলে, ভারতের নানা স্থানে তীব্র প্রতিবাদ হতে লাগল।

চিত্তরঞ্জন নানা সভায় বক্তৃতা দিয়ে ভারতের ন্যায়সংগত স্বার্থের কথা প্রচার করতে লাগলেন।

ভারতকে ক্রমশ স্বায়ত্ত শাসন অধিকার দেওয়া হবে, তখনকার ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ আগষ্ট এই কথা

ঘোষণা করলেন। তিনি ভারতের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালাবার জন্য ভারতে এলেন ঐ বছরেরই শেষের দিকে।

"ভারত স্বায়ত্ত শাসন অধিকার লাভ করার খুবই উপযুক্ত", এই কথা প্রচার করবার জন্য চিত্তরঞ্জন দেশের নানা স্থানে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এই কাজ করবার জন্য, চিত্তরঞ্জনের আইন ব্যবসায়ের কাজে বাধা পড়তে লাগল। অর্থ উপার্জনে বাধা হতে লাগল। কিন্তু দেশের স্বার্থের জন্য চিত্তরঞ্জন নিজের স্বার্থ উপেক্ষা করলেন।

চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর ময়মনসিংয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন। তখন তিনি বললেন সেই কথা, যা হচ্ছে অতি সার কথা। তিনি বললেন "দেশই আমার ধর্ম্ম—আমার চিরজীবনের আদর্শ—ঐ দেশ। দেশ বলিলে, আমি আমার সম্মুখে আমার ভগবানকে দেখিতে পাই।"...

কলিকাতায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

তখন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন বৈকুণ্ঠনাথ সেন। সভানেত্রী হলেন এনি বেশাণ্ট।

সেই মহাসভায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ভারতের স্বায়ত্তশাসন অধিকার লাভ সম্বন্ধে প্রস্তাব ঘোষণা করলেন।

চিত্তরঞ্জন সেই সভায় ভাষণ দিলেন।

॥ বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন ॥

তখনকার পরাধীন ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে।

সেই রিপোর্ট ভালো, কি মন্দ, সেই সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা

করার জন্য বোম্বাই শহরে বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল আগষ্ট মাসে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরামর্শ অনুসারে, সেই অধিবেশনের সভাপতি হলেন হাসান ইমাম।

সেই শাসন সংস্কার রিপোর্ট অনুসারে কার্য হলে, তা হবে ভারতের স্বার্থের বিরোধী, এই হল কংগ্রেসের অভিমত।

।। রাউলাট আইন ।।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কিরূপে বাধা দেওয়া যায়, তাই স্থির করার জন্য ইংরাজ সরকার "রাউলাট কমিটি" নামে এক কমিটি গঠন করেছিল।

ইংলণ্ডের মিঃ রাউলাট নামক একজন বিচারক হলেন সেই কমিটির সভাপতি। সদস্য হলেন প্রভাসচন্দ্র মিত্র, বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বেসিল স্কট, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি করণস্বর্ণী শাস্ত্রী, এবং সার লভেট ফ্রেজার।

ঐ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হল ১৯১৮ সালের ১৯শে জুলাই।

ঐ সম্বন্ধে কংগ্রেসের পূর্বোক্ত ঐ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। সেই প্রস্তাবে তিনি বললেন, ঐ রিপোর্ট অনুসারে যা কিছু করা হবে, তা হবে ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর।

ভারতের ইংরাজ সরকার ভারতের জনগণের সেই অভিমতে মোটেই কান দিল না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ সেই রাউলাট আইন বলবৎ হয়ে গেল।

তখন গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, 'রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ জানানোর জন্য সমগ্র ভারতে হরতাল পালন করা হবে ৩০শে মার্চ তারিখে'।

ঐ দিন কলিকাতায় গড়ের মাঠে বিরাট এক সভা অনুষ্ঠিত হল। চিত্তরঞ্জন সেই সভায় ভারতের হিতের কথা প্রচার করলেন।

ঐ সব ব্যাপার নিয়ে দিল্লীতে খুবই অশান্তির সৃষ্টি হল। সেখানে আবার হরতাল পালন করা হল ৬ই এপ্রিল তারিখে।

পাঞ্জাবের নেতা সত্যপাল এবং নেতা ডাঃ কিচ্‌লুকে ইংরাজ সরকার আটক করল।

জনগণ তখন চাইলেন তাঁদের প্রিয় নেতাদের মুক্তি।

কিন্তু সেই মুক্তি চাইতে গিয়ে, তাঁরা হলেন ইংরাজ সরকারের পুলিশের গুলী-বিদ্ধ।

জনগণ, তখন ভীত না হয়ে, আরও প্রবল হয়ে উঠলেন। তাঁরা এমন কিছু কিছু কাজ করলেন, যা হল ভারতের স্বার্থের অনুকূল, কিন্তু ভারত-বিদ্বেষী বিদেশী স্বার্থের প্রতিকুল।

পাঞ্জাবের ছোটলাট মাইকেল ও ডায়ার তখন পাঞ্জাবে জারি করলেন সামরিক আইন।

॥ জালিয়ানওয়ালা বাগে জালিয়াত ক্লাইভের কুটুম্বের ক্রূর কর্ম॥

পাঞ্জাবের অমৃতসহরে বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে সমবেত হলেন বিশ হাজারের চেয়েও বেশী সংখ্যক লোক।

সেখানে তখন সভা বসবে।

সকলে তখন দেখলেন, তাঁদের মাথার উপর উড়োজাহাজ উড়ছে। সকলে বুঝলেন, ইংরাজ সরকারের মাথা ঘুরছে।

তারপর সকলে দেখলেন, জেনারেল ও ডায়ার শ-খানেক সশস্ত্র সৈন্য এবং একটা কামান নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের একমাত্র প্রবেশদ্বারের মুখে হাজির হয়েছেন।

সেই বাগের চার ধার ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেখানে প্রবেশ পথ এবং সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ ছিল ঐ একটি মাত্র।

তারপর আরম্ভ হল নিরস্ত্র জনতার উপর ইংরাজের গুলি বর্ষণ।

কয়েক শত লোকের প্রাণ গেল। আহত হল আরও কত শত!

শত শত ভারতভক্ত দিলেন তাঁদের রক্ত। ইংরাজ সরকার টিকিয়ে রাখল তাদের তক্ত।

ওর পরেও সামরিক আইন প্রচলিত রইল কয়েক সপ্তাহ যাবৎ।

সেই কয় সপ্তাহে পাঞ্জাবে ভীষণ অত্যাচার চালিয়ে ইংরাজ সরকার দেখিয়ে দিল, তারা জালিয়াৎ ক্লাইভের যোগ্য কুটুম্বই বটে!

॥ পাঞ্জাবে ব্রিটিশের পৈশাচিক কাণ্ডে অনুসন্ধান সমিতি ॥

জালিয়ানওয়ালাবাগে জালিয়াত ক্লাইভের কুটুম্বদের ক্রূর কর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি কমিটি গঠিত হল। তার সদস্য হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, ফজলুল হক, মতিলাল নেহেরু এবং আব্বাস তায়বজী।

কিন্তু ফজলুল হক ঐ সময়ে অন্যকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সেইজন্যে তিনি অনুসন্ধান কার্যে যোগদান করতে পারলেন না। তাই শ্রীজয়াকর শ্রীফজলুল হকের পরিবর্তে সেই কার্যে যোগদান করলেন।

উদারচেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঐ অনুসন্ধান কাজের জন্য কলিকাতা থেকে পাঞ্জাবে গমন করবার ব্যয়ভার নিজেই নির্বাহ করেছিলেন।

পাঞ্জাবে অবস্থান কালে, চিত্তরঞ্জনের বেশ কয়েক হাজার টাকাই ব্যয়িত হয়েছিল।

ঐ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী এইরূপ লিখেছেন ঃ

"১৯১৯ সালে পাঞ্জাব তদন্ত সমিতিতে প্রথম এই মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। আমি সমিতিতে ত্রস্ত অন্তঃকরণে সন্দেহ সঙ্কুচিত চিত্তে যোগ দিয়েছিলাম। কারণ, তফাৎ থেকে তাঁর ব্যারিস্টারীর যশ ও প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের খ্যাতি আমার কর্ণগোচর হয়েছিল। তিনি মোটরকারে পত্নী ও পরিবারবর্গসহ এসেছিলেন এবং রাজার হালেই থাকতেন, প্রথমটা এসব দেখে অবশ্য আমি খুশী হইনি। আমি দেখেছিলাম যে, আইনের মার্‌পেঁচ বুঝতে, সাক্ষীকে জেরা করে নাজেহাল কর্ত্তে এবং সামরিক আইন সম্মত শাসন-প্রণালীর দোষগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।.........তিনি যেন যুক্তির অবতার ছিলেন এবং আমার যা বলবার ছিল তা খুব আগ্রহের সঙ্গেই শুন্‌তেন।......আমার সঙ্গে ...সব চেয়ে বেশী মিশেয়েছিলেন ভারতের এই বরণ্যে সন্তানটি।..."

॥ স্বদেশ-সেবার সোনার পথে ॥

কলিকাতায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল।

সেই অধিবেশনের সভাপতি হলেন পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী।

সেই অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল এইরূপ ঃ (১) পাঞ্জাবে বৃটিশের অত্যাচার, (২) ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন (৩) খিলাফৎ প্রশ্ন, (৪) শাসন সংস্কার।

ইংরাজ সরকারের সঙ্গে ভারতীয়রা সহযোগিতা করবেন না,—এই প্রস্তাব কংগ্রেসে গ্রহণ করা হল।

পাঞ্জাবে প্রচণ্ড অত্যাচার করা হয়েছে। যারা সে অত্যাচার চালিয়েছে, ইংরাজ সরকার তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেনি। দোষী সার মাইকেল ও ডায়ারের তারা প্রশংসা করেছে।

মুসলমানদের খেলাফৎ সম্বন্ধে ইংরাজ সরকারের যা করা উচিত, তা করা হয় নি।

ঐ সকল কারণে, ভারতবাসীকে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করার পথ অবলম্বন করতে হবে। ঐরূপ হল গান্ধীজীর প্রস্তাব।

চিত্তরঞ্জন দাশ মহোদয় প্রথমে নানা কারণে ঐ অসহযোগিতার তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ওর পরে নাগপুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল, তাতে চিত্তরঞ্জন ইংরাজ সরকারের সঙ্গে ভারতীয়দের অসহযোগিতার পথ মেনে নিলেন।

এইবার চিত্তরঞ্জনকে দেখা গেল কি অবস্থায় ?

দেখা গেল, তিনি ব্যারিস্টারি করা ত্যাগ করলেন। দেখা গেল, তিনি ব্যয়বহুল জীবন যাপন ব্যবস্থা ত্যাগ করলেন। দেখা গেল, বিপুল অর্থ উপার্জন পন্থা ত্যাগ করলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ধারণ করলেন ধুতি-চাদর। ভ্রমণ করতে লাগলেন দেশের নানা স্থানে। মিশতে লাগলেন দেশের সকলের সঙ্গে। প্রচার করতে লাগলেন ভারতের স্বরাজ লাভের জন্য কর্ম সম্পাদনের কথা।

চিত্তরঞ্জন হলেন স্বদেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জন !

॥ ব্রিটিশের আনন্দ-তাল ঃ ভারতের হরতাল ॥

ইংলণ্ডের যুবরাজকে বলা হয় প্রিন্স অব ওয়েলস্। তিনি ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর ভারতে এলেন। সে ব্যাপারে, ব্রিটিশের আনন্দ-তাল দেখা গেল উত্তাল।

এদিকে ভারতের প্রতি বৃটিশের কৃত অন্যায় ও অবিচারের সংশোধন তখনও কিছুই করা হয় নি। তাই ভারতের জনগণ সেদিন বৃটেনের যুবরাজকে অভ্যর্থনা করলেন না। তাঁরা করলেন হরতাল।—দোকান-পাট বন্ধ, বাজার বন্ধ, গাড়ী-ঘোড়ার চলাচল বন্ধ ; রাজপথে লোক চলাচল বন্ধ।

সেই দিন কলিকাতা শহরে উল্লেখযোগ্য রকমেই হরতাল পালন করা হল। চিত্তরঞ্জনের কর্মকুশলতার জন্যেই সেটি সম্ভব হল।

ভারতে জাতীয় মহাসমিতির কার্যের জন্য চিত্তরঞ্জন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করছিলেন।

ইংরাজ সরকার বলল, ও কাজ বে-আইনী কাজ। সভা-সমিতি করা চলবে না। যদি করা হয়, তা হলে তাও হবে অপরাধ।

বঙ্গের তখনকার প্রাদেশিক কংগ্রেস স্বরাজ লভের কাজ চালাতে লাগল। বিলাতী বস্ত্র বর্জন এবং খদ্দর তৈরী ও পরিধান করার জন্য প্রচার কার্য চালাতে লাগল।

ইংরাজ শাসক তখন ভারতের সেবকদের কারাগারে বন্দী করতে লাগল।

চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্রের নাম ছিল চিররঞ্জন। স্বদেশসেবক চিররঞ্জন বন্দী হলেন।

চিত্তরঞ্জনের পত্নী বাসন্তী দেবী এবং চিত্তরঞ্জনের ভগিনী উর্মিলা

দেবী কলিকাতা শহরে খদ্দর প্রচার কার্য করতে বেরিয়েছিলেন। তাঁরাও আটক হলেন।

তারপর, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর ইংরাজ সরকার গ্রেপ্তার করল চিত্তরঞ্জনকে।

ঐ দিবসেই ইংরাজ সরকারের হাতে বন্দী হলেন ভারতের বন্ধন-মুক্তির সাধনায় নিরত বিশিষ্ট কয়েকজন।

তাঁরা হচ্ছেন পরবর্তীকালে "নেতাজী" ব'লে অভিহিত সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আক্রাম খাঁ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, পদ্মরাজ জৈন এবং অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী প্রভৃতি।

॥ নামী লোক হলেন আসামী ॥

নামী লোক চিত্তরঞ্জন আসামী হলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার আদালতে আরম্ভ হল চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার বিচার।

সৎলোকেরা বললেন, এই বিচার অবিচার।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে আসামী রূপে আদালতে আনয়ন করল ইংরাজ সরকারের কর্মীরা।

আদালত তখন লোকে ভরপুর।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আদালত ঘরে প্রবেশ করা মাত্র, সকল উকিল ও ব্যারিষ্টার দণ্ডায়মান হলেন—চিত্তরঞ্জনের প্রতি প্রদর্শন করলেন সন্মান।

তারপর যা হল, তার বর্ণনার উদ্ধৃতি হচ্ছে এইরূপ ঃ

"গবর্ণমেণ্ট পক্ষের উকিল শ্রীতারকনাথ সাধুকে ডি. সিলভা প্রভৃতি অনেক উকিল চিত্তরঞ্জনকে বসবার আসন দেবার কথা বললেন। কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করলেন না,

অবশেষে এক ঘণ্টা পর কি ভাবিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সুইনহো সাহেবের নিকট চিত্তরঞ্জনকে আসন দিবার জন্য নিবেদন করলেন।"

গবর্ণমেণ্ট-উকিলের প্রস্তাবানুসারে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট চিত্তরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

"আপনাকে কি একখানি চেয়ার দিব?"

চিত্তরঞ্জন—না, আমি চেয়ার চাই না, আমি বেশ ভাল আছি, আপনাকে ধন্যবাদ ম্যাজিষ্ট্রেট।

'আপনাকে একখানি চেয়ার দেওয়া হইল, দরকার হইলে বসিতে পারেন।'

চিত্তরঞ্জন—আমি চেয়ার চাই না, ধন্যবাদ। তারপরে তাঁহাকে একখানি চেয়ার দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি তাহা ব্যবহার করিলেন না।

সরকারী পক্ষের উকিলের বক্তব্য শেষ হইলে তিনি হস্তাক্ষর প্রমাণের জন্য সময় চাহিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ১২ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিয়া চিত্তরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি কিছু বলিতে চান?"

চিত্তরঞ্জন। আমি কোন কার্য্যে যোগদান করিব না।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আমি জানিতে চাই মামলা মুলতুবী রাখিলে আপনার কোন আপত্তি আছে কি না?

চিত্তরঞ্জন—"আমি কোন কার্য্যে যোগ দিব না—আমার বলিবার কিছু নাই।"

এর পরে সেই মামলার আদালতের রায় বেরুল ১৪ই ফেব্রুয়ারি।

আদেশ দেওয়া হল: চিত্তরঞ্জন দাশ ছয় মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করবেন।

॥ ভারত নন্দনের অভিনন্দন ॥

আমেদাবাদে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল! চিত্তরঞ্জনকে নির্বাচিত করা হয়েছিল সেই অধিবেশনের সভাপতি। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তখন ছিলেন বন্দী। তাই তিনি সেই অধিবেশনে যোগদান করতে পারেন নি।

তাই সভাপতির কার্য সম্পাদন করেছিলেন হাকিম আজমল খাঁ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে অভিভাষণ রচনা করেছিলেন তার অংশ বিশেষ অধিবেশনস্থানে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন স্বনামধন্যা সরোজিনী নাইডু।

তারপর যথাসময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করলেন।

তখন কলকাতার একটি উদ্যানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে অভিনন্দন দান করলেন ভারতের জনগণ। ভারত-নন্দনের সেই অভিনন্দনপত্র সভাস্থলে পাঠ করলেন প্রখ্যাত পুরুষ প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সেই অভিনন্দনপত্রের কয়েকটি ছত্র এইরূপ :

"বীর তুমি, দাতা তুমি,—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে।.........

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না,—তাই বাঙ্গালা তোমাকে যখন 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না,.........

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া, কিছু তোমার নাই, সমস্ত দেশ তাইত আজ তোমার করতলে।........."

পরে, বিহারের গয়ায় ভারতের কংগ্রেসের অধিবেশন হল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। চিত্তরঞ্জন হলেন সেই অধিবেশনের সভাপতি।

তখনকার ইংরাজ সরকারের আইন—কাউন্সিলের সদস্য হয়েও, সেখানে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে কার্য করে ভারতের স্বরাজ লাভের জন্য কিছু কার্য করা সম্ভব হতে পারে, এইরূপ ধারণা চিত্তরঞ্জন পোষণ করতেন।

কিন্তু তখন ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা মহাত্মা গান্ধী ঐ কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু সেইজন্য চিত্তরঞ্জন দাশ দমে যাননি মোটেই। তিনি এবং তাঁর স্বরাজ্যদল নামক সহকর্মীদের চেষ্টায় কাউন্সিলে প্রবেশের অভিপ্রায় কার্যে পরিণত হয়েছিল। দেশবন্ধুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান বহু বিখ্যাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি স্বরাজ্যদলের নিকট পরাভূত হয়েছিলেন।

॥ কলিকাতা কর্পোরেশনের মহান মেয়র ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তাঁর সহকর্মী স্বরাজ্যদল কলিকাতা মিউনিসিপালিটির বা কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্বও অধিকার করেছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হয়েছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র,—মহান মেয়র।

কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হয়েছিলেন সুভাষ-চন্দ্র বসু।

স্বদেশের পরাধীনতা দূর করবার জন্য দেশ-সেবার কাজ করে-ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে, তিনি, শেষপর্যন্ত অতিশয় রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তবু স্বদেশ সেবার পথ পরিত্যাগ করেননি।

তখনকার অবিভক্ত বঙ্গদেশের ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেইটির সভায় তাঁর শেষ ভাষণ। ঐ সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ে। তাই শরীর যাতে ভালো হয়, সেইজন্য তাকে গমন করতে হয় স্বাস্থ্য-নিবাস দার্জিলিংয়ে। কিন্তু স্বদেশকে সুস্থ ক'রে তোলবার —স্বাধীন ক'রে তোলবার সাধনায় নিমগ্ন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শরীর আর সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

॥ পর দুঃখ মোচনে দান ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন-জীবন সবই মানুষের মঙ্গলের জন্য দান করেছেন।

"বন্দে মাতরম্" বাণীই ছিল তাঁর জীবনের মন্ত্র—জীবনের আদর্শ।

চিত্তরঞ্জনের আর্থিক অবস্থা যখন ছিল অসচ্ছল, তখনও সাহায্য করতেন, এবং তাও করতেন ধনী ব্যক্তির নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

জাতীয় দলকে তিনি সর্বদাই প্রচুর অর্থ দান করতেন।

নবদ্বীপের নানা পুণ্য প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত হত চিত্তরঞ্জনের দান।

পুরুলিয়ার একটি অনাথ আশ্রম প্রতি মাসে চিত্তরঞ্জনের নিকট থেকে লাভ করত দুই হাজার টাকা।

বহু দরিদ্র ও দরিদ্রার কন্যা তাঁদের বিবাহকার্য নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ লাভ করে হয়েছেন ধন্য।

বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত পবিত্র উৎসবের জন্যও চিত্তরঞ্জন অর্থদান করেছেন। সেখানকার উৎসব কালে কার্যে নিযুক্ত নানারূপ নিম্ন পর্যায়ের কর্মী ও সুমহান কর্মী চিত্তরঞ্জনের দান প্রাপ্ত হয়েছেন।

চিত্তরঞ্জন বিভিন্ন মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য ব্যারিস্টাররূপে যেখানেই গমন করতেন, সেখানেই প্রচুর অর্থ দান করতেন।

নানারকম বিদ্যালয় ও পাঠাগার তাঁর দান প্রাপ্ত হত। গরীব ছাত্রেরা পেত পরীক্ষার ফী, পেত পাঠ্য পুস্তক ক্রয়ের অর্থ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটি পরিচারকের নাম ছিল বেণী। সেই বেণীর হাতেই থাকত উদারতা ধনে ধনী চিত্তরঞ্জনের টাকা-কড়ি। সেই বেণীই চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা অনুসারে টাক-কড়ি লোককে দিয়ে দিত।

চিত্তরঞ্জন তাঁর কোন কার্যের জন্য কারুর হাতে যে টাকা দিতেন, সেই টাকার মধ্যে যা অবশিষ্ট থাকত, তা তিনি আর ফেরত নিতেন না।

ভারতের স্বরাজ-সাধনার জন্য চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারি ত্যাগ করার পর তাঁর সর্বদাই ছিল অর্থাভাব। কিন্তু তবু ফুরিয়ে যায়নি তাঁর দান করার মনোভাব।

পৃথিবীতে যখন চিত্তরঞ্জনের জীবনের দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, সেই সময়ে একদিন এক বিধবা এলেন চিত্তরঞ্জনের নিকট।

বললেন সেই বিধবা, "আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা যোগাড় করতে পারছি না।"

ওর চেয়ে বেশী সেই বিধবাকে আর বলতে হল না।

স্বদেশ সেবাই তখন চিত্তরঞ্জনের একমাত্র বিত্ত। টাকা-কড়ি তখন তাঁর নেই।

বিধবার কথা শুনে, চিত্তরঞ্জন দৃষ্টিপাত করলেন নিজের হাতের প্রতি। আঙুলে তখন রয়েছে একটি আংটি।

পরক্ষণেই, সেই আংটিটি চিত্তরঞ্জনের আঙুল থেকে চ্যুত হল। চলে গেল অন্যত্র। একটু পরেই এল ছয়শত টাকা।

সেই বিধবা সেই টাকা পেলেন। তাঁর কন্যার বিয়ে দিলেন।

চিত্তরঞ্জন তাঁর সমগ্র জীবনরূপ বাড়ীখানি স্বদেশের সেবায় দিয়ে দিয়েছেন।

কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের তাঁর বাড়ীখানিও তিনি স্বদেশের জনগণের জন্য দিয়ে দিয়েছেন।

পরে চিত্তরঞ্জন কলিকাতার বিশপ লিফ্রয় রোডে একখানি বাড়ী ভাড়া করে সেখানে অবস্থান করেন।

সমগ্র স্বদেশই তখন তাঁর বাসভবন। স্বদেশের জনগণের মন তখন তাঁর বাস-ভবন।

॥ স্বরাজ সাধনার ঋত্বিক চিত্তরঞ্জন সাহিত্যিক ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভারতের পরাধীনতার অন্ধকার দূর করবার এক রবি! তাঁর জীবন ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞের হবি।

চিত্তরঞ্জন কবি। চিত্তরঞ্জন রেখে গেছেন অমৃতময়ী কবিতা।

চিত্তরঞ্জন তাঁর অল্প বয়সেও কবিতা রচনা করেছেন। বেশী বয়সে তো করেছেনই।

তাঁর প্রথম কবিতা পুস্তকের নাম "মালঞ্চ"। "মালঞ্চ" তাঁর জীবন মালঞ্চের কতিপয় কুসুম।

"সাহিত্য" নামক পত্রিকার সম্পাদক স্বনামধন্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহোদয় সেই পুস্তকখানি প্রকাশিত করেন।

- চিত্তরঞ্জনের কাব্যপুস্তক "মালা" যেন সত্যই মালা! "মালা" কবিত্বপ্রভায় আলা! চিত্তরঞ্জনের কাব্য "সাগরসঙ্গীত" যেন কবি চিত্তরঞ্জনের এক মহাসংগীত! সেই "সাগরসঙ্গীত" বহন করছে কতই মহাভাবের ইঙ্গিত।

'কিশোর কিশোরী" এবং "অন্তর্য্যামী" চিত্তরঞ্জনের কাব্য-অবদান—চিরদিনই করবে মানুষকে আনন্দ দান।

নানারূপ সভায়-সম্মেলনে চিত্তরঞ্জনের প্রদত্ত ভাষণ হয়ে আছে বঙ্গসাহিত্যের ভূষণ!

চিত্তরঞ্জন সংকীর্ত্তন শ্রবণ করতে খুবই ভালবাসতেন। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস এরং বিদ্যাপতির কাব্য তিনি খুবই পছন্দ করতেন!

স্বাদেশিকতার ভাবে পরিপূর্ণ কবিতা তাঁর ছিল অতিশয় প্রিয়।

।। চিত্তহারী চিত্ত কথা ।।

পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে একবার জেলাশাসক মিঃ কার্গিল এক মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দান করতে উপস্থিত হন।

তিনি জেলাশাসক, তাই তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে, তাঁকে আর সাক্ষীর কাডগড়ায় দাঁড় করানো হয় না, বসবার জন্য চেয়ার দেওয়া হয়।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন সেই মামলার অন্যতম ব্যবহারজীবী। তিনি শ্রীকার্গিলকে এমনভাবে জেরা করতে লাগলেন যে, কার্গিল তাঁর তখনকার অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে, খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনকে "বাবু' ব'লে তাচ্ছিল্যভরে সম্বোধন করলেন।

চিত্তরঞ্জন তখন সেই বিদেশী শাসকের ভাবটা বরদাস্ত করলেন কি?

মোটেই না!

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, "মিঃ কার্গিল, নিতান্ত ভদ্রতা করেই যে তোমাকে এই আদালতে উপবেশন করবার জন্য আসন প্রদান করা হয়েছে, তা তুমি উপলব্ধি করছ না? আমি এইক্ষণেই মনে করি, যেটুকু ভদ্রতা তুমি লাভ করেছ, অন্তত সেইটুকু ভদ্রতা তুমিও প্রদর্শন করবে।"

আলিপুরের আদালতে যখন বোমার মামলা চলছিল, তখন এক দিন বিদেশী বিচারক এক প্রসঙ্গে ব'লে উঠলেন, "ননসেন্স"!

নির্ভীক ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনও অমনি সঙ্গে সঙ্গেই ব'লে ফেললেন,

'আপনি এখানে বিচারক! তা নাহলে, অন্যত্র কোন জায়গায় হলে, আপনাকে এখন আমার কি বলা উচিত, তা আমি জানি।"

বিগত ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তখনকার সুবিখ্যাত "বেঙ্গলী" নামক ইংরাজী পত্রিকায় চিত্তরঞ্জনের সাধুতা সম্বন্ধে যে রচনা প্রকাশ করা হয়, তার উদ্ধৃতি এইরূপ :—"মিঃ সি. আর. দাস প্রায় ৬৮ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করিয়া গৌরবজনক কার্য করিয়াছেন। ঋণের এক পয়সাও তাঁহার না দিলে চলিত। সাত বৎসর পূর্বে "দেউলিয়া" হইয়া এই ঋণ হইতে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ইহা মনে করিতে হইবে যে, এ ঋণ তাঁহার নহে—তাঁহার বৃদ্ধ পিতার ঋণের দায়িত্ব তিনি নিজ স্বন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ঋণ-ভার গ্রহণ তাঁহার পিতৃভক্তির পরিচয়। দেউলিয়া হইয়া বড় কেহ এসম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করে না। মিঃ সিংহ সত্যই বলিয়াছেন যে, এরূপ কার্য্য প্রায়ই দেখা যায় না।...... ....."

"বেঙ্গলী" পত্রিকার ঐ অভিমত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়েরই নাকি রচনা।

বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন বহুকাল সাহেবী ধরনেই জীবন যাপন করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি যে পরিপূর্ণরূপে ভারতীয় ভাব অবলম্বন করেছেন, তাও সকলেই দেখেছেন।

সেই দুই দৃশ্য যেন পুণ্যস্নানের আগের এবং পরের দৃশ্য।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন স্বদেশ-সেবায় পূর্ণ মাত্রায় যোগদান করার জন্য ব্যারিস্টারি ব্যবসায় পরিত্যাগ করলেন, তখন তাঁর আয় ছিল সুবিপুল। ওর পরের বছরে ১২ লাখ টাকা রোজগার হবে এরূপ মোকদ্দমা পরিচালনা করবার জন্যও তখন তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু স্বদেশ সেবার দিকে ছিল তাঁর মন। তিনি চাননি ধন।

একবার তখনকার কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান-বিচারপতি লরেন্স জেঙ্কিন্স চিত্তরঞ্জনকে বললেন, "ক্যালকাটা ক্লাবে তো বহু ভারতীয় ভদ্রলোকই এসে থাকেন। কিন্তু আপনি সেখানে যান না কেন?"

চিত্তরঞ্জন উত্তর দিলেন, "আপনারা আমাদের এই দেশের মানুষকে আপনাদের "বেঙ্গল ক্লাবে" প্রবেশ করতে দেন না। অথচ, আবার, আপনাদের ক্যালকাটা ক্লাবে এদেশের মানুষের প্রবেশের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।—এই ব্যবস্থা যে করে রেখেছেন, তা কি উদারতা দেখাবার জন্যে? আপনাদের ঐ দুইপ্রকার ব্যবস্থায়, আমার এই দেশের মানুষের হয় অপমান– যেখানে আমার দেশের মানুষে অপমান, সেখানে কি আমি গ্রহণ করতে পারি স্থান!"

চিত্তরঞ্জন ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। কিন্তু ব্রাহ্মদের কোন কোন ভাব তিনি ভাল ব'লে মনে করতেন না।

অজ্ঞেয়তাবাদীও তিনি কিছুকাল ছিলেন তাঁর প্রথম বয়সে।

চিত্তরঞ্জন তাঁর পিতা ও মাতার শ্রাদ্ধ পুরোপুরি ব্রাহ্ম-প্রথায় সম্পন্ন করেননি।

চিত্তরঞ্জনের দুহিতাদের বিবাহে পুরোহিত ছিলেন ব্রাহ্মণ।

চিত্তরঞ্জন বলতেন, তিনি হিন্দু, কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা তিনি মানেন না।

তাঁর জামাতারা কেউ ছিলেন ব্রাহ্মণ, কেউ ছিলেন কায়স্থ।

সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে, মনে হবে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চিত্ত ছিল যেন এক তীর্থ—মহাতীর্থ।

॥ মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণ ॥

চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন মহাপ্রাণ পুরুষ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরাধীনতার ফলে নিষ্প্রাণ-প্রায় ভারতে স্বাধীনতারূপ প্রাণসঞ্চার করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।

সেই পরিশ্রমের ফলে ক্রমে ক্রমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকেরা তখন তাঁর স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁকে স্বাস্থ্যকর স্থান দুর্জয়লিঙ্গে বা দার্জিলিংয়ে গিয়ে অবস্থান করার পরামর্শ দেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন দার্জিলিংয়ে গমন করেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যনিবাস দার্জিলিং চিত্তরঞ্জনকে স্বাস্থ্য দান করতে সমর্থ হয়নি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে দার্জিলিংয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

হল মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণ

॥ চিত্তরঞ্জনের চিত্তরঞ্জনী রচনা-সোনা ॥

স্বদেশ সেবাকেই
চিত্তের চিত্ত
গণ্য করেছিল বিত্ত।
চিত্তের জীবন-চিত্র
আমাদের উন্নতির সহায়ক
পরম মিত্র।
দেশবন্ধু চিত্ত
আমাদের পরম চিত্ত।

"আজ বাঙ্গালীর মহাসভায় আমি বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য। আজ এই মিলন-মন্দিরে আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতা লইয়া জটিল-কুটিল অনেক প্রকার বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সময় অযথা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার, তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাঙ্গলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্বেও আমার বাঙ্গলার যে মূর্তি তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে এই মোহিনী মূর্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই যে আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম জ্বলন্ত প্রদীপের মত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে। আপনাদের সকলের সমবেত যে যোগ্যতা, তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

* * *

স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল। একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল!......এই যে মহা বন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া, ডুবিয়া, বাঁচিয়াছি। বাঙ্গলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গলার যে ইতিহাসের ধারা,

তাহাকে কতটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শিব শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দ-দাসের গান, লোচনদাসের গান সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতে আমরা মজিলাম।······রামমোহনের তপস্থার নিগূঢ় মর্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি সেই—

“তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।”

সেই মাকে দেখিলাম—চিনিলাম।······বুঝিলাম; রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্করাজ্য ছড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন? বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী।······

॥ কৃষকের কথা ॥

আমাদের বর্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই আমাদের কৃষিজীবীর কথা মনে আসে, তারপরই আমাদের দারিদ্র্যের কথা মনে হয়। কৃষকের কথা ও দারিদ্র্যের কথা একই কথা বলিয়া মনে হয়। আমরা সকলেই জানি যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবে

কৃষিকার্য্যই আমাদের উপজীবিকার প্রধান উপায়। আমরা সকলেই জানি যে, বাঙ্গালী জাতির মত এত দরিদ্র জাতি বোধ হয় জগতের আর কোথাও নাই। কিন্তু ঘোর দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা বোধহয় ভাল করিয়া জানি না, সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি না, আমরা ত' একেবারে এক মুহূর্তে দরিদ্র হইয়া পড়ি নাই—আমরা যে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছি। তাই এই অতি সত্য যথার্থ অবস্থা আমরা ঠিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। বিদেশীরা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসে, তখন তাহারা আমাদের সোনা-রূপার প্রাচুর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সে সোনা-রূপা আসিত কোথা হইতে? বাঙ্গলা দেশে ত' সোনা-রূপার খনি নাই, তবেই বলিতে হইবে যে, আমাদের কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে আমরা অনেক অর্থ উপার্জন করিতাম।...

।। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ।।

......শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের চলিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য না হইলে আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যের অবসান কিছুতেই হইবে না।...

আমাদের বাণিজ্য নাই, তাই মা লক্ষ্মীও বাঙ্গলা ছাড়িয়া গিয়াছেন্। বাঙ্গালার সুখ-দুঃখও সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া গিয়াছে, আছে শুধু সুখের মোহ আর দুঃখের যন্ত্রণা ও অবসাদ।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার সংঘাতে আজ আমরা নিজের সুখ-দুঃখ ভুলিয়াছি, কিন্তু এমনইত আমরা ছিলাম না, সবই ত আমাদের ছিল, পেটের ভাত, রুটি—লজ্জানিবারণ ও আমরা নিজেরাই আমাদের সে লজ্জা নিবারণ করিতাম।

......একদিন ছিল—বাঙ্গলা শুধু নিজের লজ্জা নিবারণ করিত না, জগতের ঘরে ঘরে কাপড় বিলাইত। ......ইংরাজ আগমনের

সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলার সেই বৈভব নষ্ট হইয়া গেল।

...দুর্ভাগা বাঙ্গালী আমরা বণিকের যূপকাষ্ঠে আমাদের কি ব্যবসা বাণিজ্য সকলই বলি দিলাম। আমাদের ঘরে ঘরে চরকা ভাঙ্গিয়া গেল, অনাচারে. অশ্রদ্ধায় শক্তিহীনতায়, ভক্তিহীনতায় আমাদের গৃহধর্মকে, আমাদের স্বভাব ধর্মকে বিসর্জন দিলাম।......

কেন এমন হইল, কি পাপে মা লক্ষ্মী আমাদের ত্যাগ করিলেন ?

নিজের ইতিহাসের সাক্ষ্য যাহাই হউক, ভিতরের কথা ভাবিয়া দেখিলে দোষ আমাদেরই।

যে আপনাকে দুর্বল করিয়া রাখে, দুর্বল হইতে দেয়, তাহার বলহীনতা যে তাহারই দোষ।

ঘরের ধন "চৌকি না দিয়া" যে পরের হাতে তুলিয়া দেয়, দোষ তাহার,......

ভুল কোথায় ? ভুল আদর্শের সংঘাত।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের যে বিরোধ, সেই বিরোধেই আমাদের এই দুর্বল শক্তিহীন অবসন্ন দেহ।

নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিবার শক্তি ছিল না, সেই দৌর্বল্যই আমাদের দোষ, সে দোষ ত এখনও যায় নাই ...

॥ আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা ॥

……আমার মনে হয় ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষাবিস্তার করায় অনেক দোষ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আমাদের হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার সবই এত ইংরাজী-নবীশ হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের কোন যোগ নাই।

এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া তাহার প্রাণের কাছে গিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারি নাই, কেবল উপর হইতেই দেখিয়াছি, আর কতকগুলো ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করিয়াছি। আমরা মানুষ হইয়া উঠি নাই, একটু বেশী চালাক হইয়াছি মাত্র!…

…আমার মনে হয়, আমাদের এই নব-জাগরিত জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চালনা করিতে হইলে, আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদেরই ভাষায় দিতে হইবে।

নিজের ভাষা শিখিতে হইলে নিজের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইবে এবং আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার যে সরল সত্যবাণী, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইসব দিকে চোখ রাখিয়া যে উচ্চ শিক্ষা তাহাই প্রকৃতপক্ষে উচ্চ।…

আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গলার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধ-চিত্তে পবিত্র-প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। ইহাতে বর্ণ, ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে।

কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না।…এস এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস, সবাই এস! বল বন্দে মাতরম্।

—*—

॥ আমার ঈশ্বর ॥

সম্মুখে পশ্চাতে মোর জীবন ব্যাপিয়া,
ঘনায়ে আসিছে ধীরে অন্ধ-অন্ধকার !
নিষ্প্রভ নয়ন হতে যেতেছে হারায়ে
জীবনের লক্ষ্যগুলি ; ভাঙ্গিয়া পড়িছে
প্রাণের আবাস ! তাই আজ ডাকিতেছে
বারে বারে, কোথা ও হে নিখিল নির্ভর !
আমার এ অর্দ্ধ অন্ধ জীবনের ভার
লহ তুলে, আশ্বাসিয়া বিপন্ন হৃদয় ।
ওহে চিরোজ্জ্বল রবি ! কেন অন্ধকার
জীবন ভরিয়া মোর ? কেন আশে পাশে
মৃত্যু-ভরা প্রেত-ছায়া, নিষ্ঠুর-নর্ত্তনে,
জীবনের প্রতি কক্ষ করে আন্দোলিত ?
ওহে দেব ! তুমি কর অভয় প্রদান,
আমার হৃদয়-পুষ্প সাদরে চুম্বিয়া
সুরঞ্জিত কর প্রভু ! স্বর্ণ-করে তব ।

॥ জীবনের গান ॥

সুপ্রসন্ন সুপ্রভাত আজি !
সুন্দর সূর্য্যের আলো
চরাচর চক্ষে,
সুমন্দ বসন্তবায়ু
অবনীর বক্ষে
প্রস্ফুটিছে শত পুষ্প-রাজি
পুলকচঞ্চল দল শত পুষ্পরাজি
সুবসন্তে আজি !

চারিদিকে সুবর্ণ স্বপন !
এমন বিহঙ্গ মোর
কোথা উড়ে যায়,
ধরণী ছাড়িয়া কোন্
গগনের গায় ?
মোহমগ্ন জীবন মরণ—
কি স্বপ্ন চুম্বিয়া আজি সুবর্ণ বরণ
জীবন মরণ।

॥ মোছ আঁখি ॥

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ।
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন্ গো ক্রন্দন ?

অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে.
হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।

হায়, হায়, জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি—নয়ন কিরণে,
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে—বিফল জীবনে।

আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা ;
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

॥ নিবেদন ॥

হে মোর বিজয়ী রাজা! এস তবে আজ
সময় উল্লাস-ভরা বিজয় হুঙ্কারে !—
দর্পভরে সগৌরবে ওগো রাজরাজ !
এস আজ রুদ্ধ এই অনন্ত-দুয়ারে !
ছিন্ন কর বক্ষ মোর কৃপাণে তোমার,
চূর্ণ ক'রে দাও মোর সোণার মন্দির !
ধূলিসাৎ হয়ে যাক্ হৃদয়-আঁধার,
বিজয় দুন্দুভি তব বাজুক গম্ভীর।
আমি অশ্রুজল চখে পরাইব আজ
জয়মাল্য তব কণ্ঠে ওগো রাজরাজ !

১

আজিকে পাতিয়া কান,
শুনিছি তোমার গান
হে অর্ণব ! আলো ঘেরা প্রভাতের মাঝে
একি কথা ! একি সুর !
প্রাণ মোর ভরপূর,
বুঝিতে পারি না তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে ।

৮

তোমারি এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ !
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী !—বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে,
বাজাও নির্জন তীরে, বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ ঊষায়,—
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায় ।
ওগো যন্ত্রি ! আমি যন্ত্র, বাজাও আমারে,—
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে !

।। বাঙ্গালীর সঙ্গীত ।।

আজি এ আলোকপূর্ণ সুন্দর আকাশ
গাহিছে আশার গীতি ; পূর্ণ কর আশা ;
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।

করহ সার্থক আজ সত্যের সাধিয়া,
দূর করি, হিংসা-দ্বেষ, বিদ্রূপ, বিলাস,—

এই মহামন্ত্র রাখি বক্ষেতে বাঁধিয়া—
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।
ওই হের। দেবতারা প্রসন্ন হইয়া
লিখেছে গগন-ভালে রবি-রশ্মি দিয়া—
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।

দেবতা কহিছে কথা অন্তরে ভরিয়া
দেবতার বাক্যে আজ পূর্ণ কর মন,
আপন কর্মের চির হস্তে আঁকড়িয়া,
আপন ধর্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন।

———